মানব সভ্যতার প্রাচীন যুগ







ঊষাকান্ত দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রচারিত সর্বশেষ সিলেবাস (Notification No. Syll/78/9 Dt. 2. 9. 78) অনুসারে **ষষ্ঠ শ্রেণার** জন্য লিখিত এবং পর্ষদ কর্তৃক T.B. No. VI/H/79/102 Dt. 5. 12. 79. দ্বারা অনুমোদিত।

মানব সভ্যতার প্রাচীন যুগ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক উষাকান্ত দত্ত, এম. এ., বি. টি. (পদকপ্রাপ্ত)
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

নবভারতী প্রকাশনী
(প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা)
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
আনন্দকুমার পাল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম মুদ্রণ : জুন, ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৯
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮২

নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র
মূল্য—ছয় টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয় কুমার ঘোষ
জয়শ্রী প্রেস
৯ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ ভূমিকা ॥

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দেশিত নতুন পাঠক্রম অনুসারে এবং পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে **ষষ্ঠ শ্রেণীর** ইতিহাস প্রকাশিত হল। পূর্ববর্তী পাঠক্রম থেকে বর্তমান পাঠক্রম এক বিরাট পরিবর্তন, তাই বলে একেবারে নতুন নয়। সামগ্রিক বিষয়গত বিন্যাসের দিক থেকে বর্তমান পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অপরিচিত নয়।

কিন্তু এবারে লক্ষণীয় বিষয়বস্তুর আবেদনগত পরিবর্তন। রাজবংশানুক্রমিক ইতিহাসের পরিবর্তে মানব সভ্যতার বিবর্তনগত দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা হয়েছে, এবং কোন সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিক ইতিহাস-চেতনার বিচারে এই যে আবেদনগত পরিবর্তন তার যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত।

প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করে নিতেই হয় পাঠ্যপুস্তকের বিধিগত সীমাবদ্ধতা ইতিহাস ব্যাখ্যায় বিঘ্ন ঘটায়। তথাপি দশ বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং আরও একাদশ বর্ষব্যাপী শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দানের চেষ্টা করেছি। প্রচেষ্টার পরিমাপ হবে স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রী এবং সহৃদয় সহকর্মী শিক্ষকদের সমাদর দিয়ে।

পাণ্ডুলিপি সংস্কার এবং পূর্ণলিখনে শ্রীমতী অপর্ণা দত্ত যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি রচনায় অযথা কালক্ষেপণের অত্যাচার অম্লান বদনে মেনে নিয়ে, অথচ যথাসময়ে বই প্রকাশ করে আমার গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন আমার প্রকাশক।

রাসপূর্ণিমা
কোচবিহার/১৯৭৯

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

বইটির প্রথম প্রকাশে প্রাপ্ত সমাদর যথেষ্ট উৎসাহবর্ধক না হলেও নিরুৎসাহের নয় এবং এই সীমিত সমাদরের কারণও সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের মানদণ্ড কেবলমাত্র পুস্তকের গুণগত উৎকর্ষ নয়, বরং এমন সব কিছু যেখানে উৎকর্ষের দিকটা বহুলাংশে বর্জিত। তবুও চেষ্টা করে যেতে হয় এই আশায় যে একদিন নিশ্চয়ই শুভ চেতনার উন্মেষ ঘটবে।

বর্তমান সংস্করণে বইটির গুণগত মানকে আরও উন্নত করার চেষ্টায় প্রতি অধ্যায়ের শেষে অতি সংক্ষেপে ঐ অধ্যায়ের মূলকথা সংযোজিত হল, অনুশীলনী একেবারে ঢেলে সাজানো হল, বিষয় বিশ্লেষণেও ভাষাগত বিভ্রম যতটা নজরে এসেছে দূর করার চেষ্টা করা হল।

আশা করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই সব সংস্কারের ফলে বইটি আরও বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। যাঁরা বইটিকে পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা দিয়েছেন, যাঁরা দিতে চেয়েও অনিবার্য কারণে পারেন নি এবং যাঁরা বইটি আদৌ বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করেন নি তাঁদের সবাইকে আমার সকৃতজ্ঞ শুভেচ্ছা।

কোচবিহার
১ জানুয়ারি, ১৯৮১

উষাকান্ত দত্ত

চতুর্থ সংস্করণের

ভূমিকা

বইটির চতুর্থ সংস্করণ পরিমার্জিত করে বের করা হল। অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন এই সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে।

বইটির ব্যাপক চাহিদার পিছনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুচিন্তিত নির্বাচন অনেকখানি সাহায্য করেছে। এজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাসপূর্ণিমা
কোচবিহার, ১৯৮২

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস পাঠ ও জানা ঃ	পাঠবিন্যাস ঃ (১) কেন আমরা ইতিহাস পড়ব (২) ইতিহাস কেমন করে জানা যায়

বিষয়-সংকেত ঃ আমাদের কার না ইচ্ছে হয়, নিজেদের ছোটবেলার কথা জানার। ঠিক তেমনি ইচ্ছে হয়, নিজের দেশেরও পুরানো কথা জানতে। কিন্তু তা জানা তো খুব সহজ কথা নয়। পঞ্চাশ বছরের পুরানো কথা জানতেই কত অসুবিধে। আর হাজার বছর হলে তো কথাই নেই। তবু জানতে হয়, কিন্তু কেমন করে প্রথমে আমাদের তাই শিখতে হবে।

কেন আমরা ইতিহাস পড়ব ঃ আমরা সবাই যখন আমাদের প্রত্যেকের ছোটবেলার নানান কথা বড়দের মুখে শুনি, তখন আমরাই অবাক হয়ে যাই। যেন বিশ্বাসই হয় না আমরা একদা ঐ রকম ছিলাম। কিন্তু ছিলাম যে তাতো নিঃসন্দেহে সত্যি।

ঠিক যেমন আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের কথাই নিজেদের অবাক করে তেমনি গোটা মানবজাতির অতীত কথাও আমাদের অবাক করে। একদিন মানুষের জীবন ছিল বন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। গায়ে বড় বড় লোম। খাদ্য কাঁচা মাংস। বাস প্রথমে গাছের ডালে, তারপর পাহাড়ের গুহায়। এই মানুষই একদিন আগুন আবিষ্কার করে ফেলল, আগুন ব্যবহার করতে শিখল, কৃষিকাজ করতে জানল, ফসল ফলাতে লাগল, ধীরে ধীরে বাড়ী ঘর তৈরী করল। তৈরী হল গ্রাম, শহর। কতদিনের কত চেষ্টার ফলে কেবল সুখে থাকার জন্য মানুষ আরও কত কিছু আবিষ্কার করতে লাগল। মানুষ কখনো এক জায়গায় থেমে থাকতে জানে না, জানে শুধু কেমন করে আরও ভাল থাকা যায়, আরও উন্নত হওয়া যায়।

এই যে মানুষের বিরামহীন চেষ্টা তার কারণই হল কিছুতেই মানুষের তৃপ্তি নেই, আশার শেষ নেই। তাইতো মানুষ কত যুগ ধরে শুধু চেষ্টা করেই চলেছে। এইভাবেই মানুষ তৈরী করে নিয়েছে বর্তমান যে জীবনধারা দেখি, তাই। আর এই জীবনধারাকেই তো আমরা বলি সভ্যতা।

তাই যে সভ্যতা আমরা নিজেরাই তৈরী করেছি তা কেমন করে তৈরী করলাম তাতো আমাদের জানতেই হবে। যে বিষয় পড়লে এই সভ্যতার নানা কথা আমরা জানতে পারি, তার নাম **ইতিহাস**।

ইতিহাস কেমন করে জানা যায়ঃ হাজার হাজার বছর ধরে কত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা আজকের জীবনধারাকে পেয়েছি। এই জীবনধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাকে জানতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু তার ইতিহাস, যা হাজার বছরের পুরানো, তা আমরা জানতে পারি কিভাবে ?

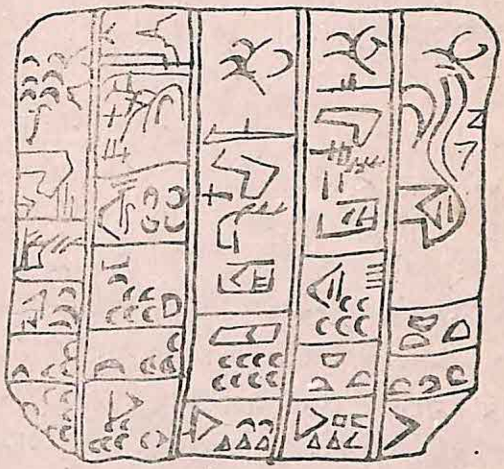
বাড়ীতে যেমন অনেক বিখ্যাত লেখকের বই পড়ে সেই লেখককে আমরা জানতে পারি কিংবা কোন মহাপুরুষের ছবি দেখে যেমন তাঁকে চিনতে পারি, তেমনি প্রাচীনকালের মানুষদের কথা জানারও অনেক উপায় আছে।

যেমন, প্রাচীনকালে কোন শহর হয়তো ভুমিকম্পে অথবা কোন বন্যায় বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির তলে চাপা পড়ে গেল। তারপর বহুকাল পর একদিন সেই শহর আবার মাটি খুঁড়ে বের করা হল। আমরা নতুন করে তখন সেই শহরের কথা জানতে পারি। সেই শহরে পাওয়া গেল তখনকার মানুষের ব্যবহার করা পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, দেবদেবীর মূর্তি। তা থেকে সে যুগের মানুষদের বিষয়ে নানা কথা জানা যায়। অথচ কতকাল হয়তো এর কথা আমরা জানতামই না। এইভাবে ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টাকে বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

আবার প্রাচীন রাজাদের রাজপ্রাসাদ বা তাঁদের তৈরী বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ থেকেও তাঁদের রাজত্বকালের অনেক খবর আমরা পেতে পারি। তাঁদের সময়কার কোন মুদ্রা ও শীলমোহর পাওয়া গেলে সেই মুদ্রা বা শীলমোহর থেকে তাঁরা কোন সময় রাজত্ব করতেন তা আমরা বলতে পারি।

তারপর প্রাচীনকালে যে সব গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল তা থেকেও সেই সময়কার অনেক কথা জানা যায়। যেমন রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দুটি মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্য পাঠ করে তখনকার

সাধারণ মানুষের অবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি অনেক তথ্য জানা যায়। এরকম নানা দেশের নানা মহাকাব্য রয়েছে। সে সব মহাকাব্য সেই সব দেশের প্রচীনকালের নানা কথা জানতে আমাদের সাহায্য করে।



প্রাচীন লিপি

প্রাচীনকালে রাজারা অনেক সময় তাঁদের অনেক নির্দেশ পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে দিতেন। এই সব খোদাই করা নির্দেশকে বলা হয় শিলালিপি। এই শিলালিপিগুলিও আমাদের প্রাচীন ইতিহাস জানতে বিশেষ সাহায্য করে। যেমন আমাদের দেশে অশোকের শিলালিপ থেকে তাঁর শাসনকালের অনেক কথা আমরা জানতে পারি।

তাছাড়া মানুষ তো সব সময়ই অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে চায়। এই দেখা ও জানার তাগিদেই মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। প্রাচীনকালেও এমনি কত পর্যটক কত দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনো কখনো এই সব পর্যটকেরা আবার নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে রেখে যায়। তাদের বিবরণ আমাদের প্রাচীন ইতিহাস জানার এক বিরাট অবলম্বন। আমাদের দেশে যেমন প্রাচীনকালে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস এসেছিলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে গিয়েছেন। কিংবা চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ দীর্ঘকাল আমাদের দেশে থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের এইসব বিবরণ আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষকে জানবার এক বিরাট সহায়।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

যা কিছু পুরানো তাকেই রক্ষা করে ইতিহাস। আর যা কিছু থেকে আমরা সেই পুরানোকে নতুন করে খুঁজে বের করতে পারি তাকেই বলে ইতিহাসের উপাদান।

অনুশীলনী

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। ইতিহাস কাকে বলে? ইতিহাস পড়লে আমরা কি জানতে পারি?

২। শিলালিপি কাকে বলে? এই লিপি থেকে কি জানা যায়?

৩। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস বইয়ের নাম লেখ। বইটি থেকে কি জানা যায়?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। মানুষের চেষ্টার শেষ নেই কেন?

২। আমরা পুরানো ইতিহাস কিভাবে জানতে পারি?

৩। আমাদের মহাকাব্য দুটি থেকে আমরা কি কি জানতে পারি?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের কথাগুলোকে মেলাও :—

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
(ক) প্রত্নতত্ত্ব	(ক) পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বাণী
(খ) মুদ্রা	(খ) দেশবিদেশে যাঁরা ঘুরে বেড়ান
(গ) পরিব্রাজক	(গ) প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ
(ঘ) শিলালিপি	(ঘ) প্রাচীন রাজাদের রাজত্বকালের সময়
(ঙ) স্মৃতিস্তম্ভ	(ঙ) ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন শহর বের করার উপায়

২। প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলো থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ কর।

(ক) মানুষ প্রথমে বাস করতো —। (গুহায়, গাছের ডালে, বাড়ীতে)

(খ) অশোকের — থেকে তাঁর শাসনকালের অনেক কথা জানা যায়। (শিলালিপি, গ্রন্থ, বিবরণ)

(গ) পর্যটকেরা লিখে যায় —। (বিবরণ, গল্প, কবিতা)

৩। নীচের ঠিক বাক্যগুলোর পাশে 'হ্যাঁ', ভুল বাক্যগুলোর পাশে 'না' লিখ :

(ক) এক সময় মানুষ ছিল জন্তু-জানোয়ারের মত।

(খ) প্রাচীন রাজাদের রাজপ্রাসাদগুলোকেই বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব।

(গ) মেগাস্থিনিস ছিলেন একজন চৈনিক পরিব্রাজক।

(ঘ) শিলালিপিগুলিতে প্রাচীন রাজারা তাঁদের নির্দেশ খোদাই করে দিতেন।

(ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন :—**

১। ইতিহাস কাকে বলে?

২। কার শাসনকালের অনেক কথা শিলালিপি থেকে জানা যায়?

৩। এমন একজন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজকের নাম বল যিনি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এসেছিলেন?

৪। প্রাচীন মুদ্রা থেকে আমরা কি জানতে পারি?

৫। আমাদের মহাকাব্য দুটি কি কি?

(ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—**

১। তুমি তোমার পাড়ার পুরানো কথা কেমন করে জানতে পারো তার একটি তালিকা তৈরী কর।

২। কোন যাদুঘরে বেড়িয়ে এসো। সেখানে প্রাচীন ইতিহাস জানার কি কি উপায় দেখতে পেলে তার একটা বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ ঃ | **পাঠবিন্যাস ঃ** (১) আদিম মানুষের পরিচয় (২) আদিম মানুষের জীবনযাত্রা ও আগুনের ব্যবহার (৩) পুরোনো প্রস্তর যুগ (৪) নতুন প্রস্তর যুগ (৫) খাদ্য উৎপাদক মানুষ (৬ নতুন প্রস্তর যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন

বিষয়-সংকেত ঃ এখন আমরা চিড়িয়াখানায় নানা জন্তু-জানোয়ার দেখতে যাই। ভাবা যায় কি, একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবনযাত্রাও ছিল পশুর মত? সেই অবাক করা দিনগুলোর কথাই এবারে আমরা জানবো।

আদিম মানুষের পরিচয় ঃ—প্রায় চারশ' কোটি বছর আগে সূর্য থেকে একটা অংশ ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। সেই অংশই আজকে আমাদের পৃথিবী। সেই অংশ ছিল তখন সূর্যের মতই উত্তপ্ত। তারপর সেই তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হতেই লেগে গেল কতদিন। এরপর আস্তে আস্তে জন্মাল উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতি। মানুষ এসেছে তারও অনেক পরে।



আদিম মানুষ

আবার তখনকার মানুষেরা ছিল আজকের মানুষদের থেকে একেবারে অন্য রকমের। তারা দেখতে ছিল শিম্পাঞ্জীদের মত। তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে মানুষ তার আজকের আকার পেয়েছে।

কিন্তু মানুষের এই পরিবর্তন কিভাবে এল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধানের পর কতগুলো

অনুমানে এসে পৌঁছেছেন। যেমন চীনের পিকিং শহরের কাছে একটা গুহায় আদিম মানুষের হাড় পাওয়া গিয়েছে। এদের বলা হয় পিকিং মানুষ। খুব সম্ভব এরা খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে বাস করত। আবার যবদ্বীপের কাছে পাওয়া গেল কয়েকটি দাঁত, উরুর হাড় ও মাথার খুলি। এদের বলা হয় জাভা মানব। তাছাড়া ফরাসী দেশে ক্রোম্যাগ্নন নামে এক গুহায় মানুষের বসতির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। জার্মানীর নিয়ানভার্থাল উপত্যকায় পাওয়া গিয়েছে মানুষ। মনে করা হয়, এরাই হল আমাদের পূর্বপুরুষ।

॥ আদিম মানুষের জীবনযাত্রা ও আগুনের ব্যবহার ॥

আদিম মানুষ থপ্‌থপিয়ে হাঁটত। হাত দুটো হাঁটুর নীচ পর্যন্ত যেন ঝুলত। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে নাড়তে পারত না। তাই ঐ আঙ্গুলে কোন কঠিন কাজ করা সম্ভব ছিল না।

প্রথমে এরা গাছের ডালে বাস করত। বাঁচার তাগিদে নিয়মিত লড়াই করতে হত নানা জীবজন্তু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে। আর খাদ্য ছিল গাছের ফলমূল। কিন্তু কেবল ফলমূলেই বা কতদিন চলতে পারে? তাছাড়া মানুষের সংখ্যাও তো বাড়ছিল। এক বন থেকে অন্য বনে গিয়েও যখন তারা যথেষ্ট পরিমাণে ফলমূল পেল না, তখন তারা বাধ্য হল ক্ষুধার তাড়নায় বনের জন্তু শিকার করে কাঁচা মাংস খেতে। তখনো তারা আগুনের ব্যবহার জানত না। তাই কাঁচা মাংসই তারা খেত। এ সময়ে মানুষের খাদ্য সংগ্রহ ছাড়া অন্য কোন কাজই ছিল না।

আদিম যুগে প্রথমে মানুষ বাস করত গাছের ডালে। ক্রমে যখন তারা মাটিতে ভালমত হাঁটতে শিখল তখন তারা পাহাড়-পর্বতের গুহায় বাস করতে লাগল। কিন্তু প্রথম প্রথম গুহায় বাস করাটাও খুব নিরাপদ ছিল না। কেননা, অন্ধকার গুহার ভেতর কোন হিংস্র জানোয়ার আগে থেকেই থাকতে পারত কিংবা পরেও আসতে

পারত। কিন্তু মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখে ফেলে সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলল।

প্রথমে মানুষও বন্য জন্তুদের মত আগুন দেখে পালিয়ে যেত। কোন বনে বজ্রপাত থেকে আগুন লেগে গেলে বা দাবানলে বন জ্বলে উঠলে মানুষও সেই বন থেকে পালিয়ে যেত।

কিন্তু ক্রমশঃ তারা দেখল, আগুন তাদের নানাভাবে রক্ষা করতে পারে। শীতের দিনে আগুনের তাপ তাদের শীত থেকে রক্ষা



আদিম মানুষের আগুনের ব্যবহার

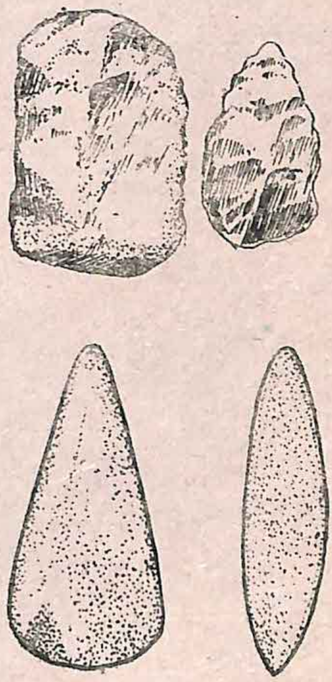
করত। গুহার ভেতর আগুন জ্বাললে কোন জন্তু যেমন বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে সাহস পেত না, তেমনি ভেতরের জন্তুও আগুন দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত। ফলে মানুষ নিশ্চিন্তে গুহার ভেতর রাত কাটাতে পারত। আবার তারা দেখল, কাঁচা মাংস আগুনে ঝল্‌সে নিলে তা খেতে অনেক সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তাই এখন থেকে তারা জ্বলন্ত বন থেকে আগুন এনে নিজেদের প্রয়োজনমত জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখত। সেই আগুন যেন নিভে না যায় সেজন্য শুকনো কাঠ-খড় এনে তা অনবরত জ্বালিয়ে রাখত। কারণ তখন পর্যন্ত তারা

কাঠে-কাঠে বা পাথরে-পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাবার কৌশল শেখেনি।

পণ্ডিতেরা বলেন, আগুন ব্যবহার করতে প্রথম শিখেছিল পিকিং মানুষেরাই। পিকিং-এর কাছে চো-কো-তিয়েন নামে পাহাড়ের গুহায় যে ছাইয়ের গাদা পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই এই অনুমান করা হয়।

যাই হোক আগুনের ব্যবহার মানুষের জীবনে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় কথা হল, কেবল আগুন ব্যবহার করে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকে ভয় দেখিয়ে মানুষ প্রথম নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারল।

কিন্তু আগুন তো সবদিক থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারত না। বিশেষ করে দিনের বেলা জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে প্রয়োজন হল মানুষের নানা ধরনের হাতিয়ার। এইসব হাতিয়ারের গঠন কৌশল দেখে পণ্ডিতেরা মানুষের এই সময়টাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ পুরানো প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ।

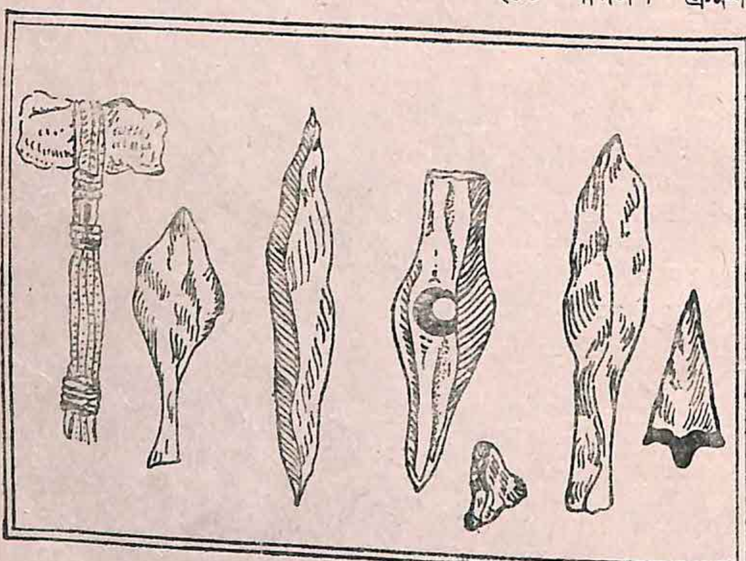

পুরানো প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

পুরানো প্রস্তর যুগ ঃ মানুষ সৃষ্টি হবার আগে এই পৃথিবীতে ছিল বিরাট বিরাট আকারের জন্তু-জানোয়ার। তাদের তুলনায় মানুষ ছিল ক্ষুদ্র অসহায় এক জীব। তবে ঐ সব জীবজন্তু থেকে মানুষ একদিকে অনেক উন্নত ছিল। তা হল, তাদের মগজে বুদ্ধি ছিল। সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করে তারা

ঐ সব জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করত। এরকম বিরাট জন্তুর কঙ্কাল এখনো যাদুঘরে গেলে দু' একটা দেখতে পাওয়া যায়। তাদের বলত ডাইনসর, ম্যামথ ইত্যাদি।

এইসব জীবজন্তুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে সেদিন মানুষ প্রথম তুলে নিয়েছিল পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে থাকা পাথর। সে পাথর ছিল ভোঁতা, অমসৃণ। ক্রমে তারা দেখেছিল সূঁচালো পাথর দিয়ে জীবজন্তুকে আঘাত করলে তাকে বধ করা সহজ হয়। পাতলা পাথর দিয়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো যায়। এভাবে মানুষ হাতের কাছে পড়ে থাকা পাথরকে নিজেদের প্রয়োজনে লাগিয়েছিল। সে পাথরকে তখনও তারা ঘষে মেজে নিতে শেখেনি। এই রকম পাথর যেকালে মানুষ ব্যবহার করত তাকে বলে **পুরানো প্রস্তর যুগ**।

নতুন প্রস্তর যুগ ঃ এভাবে চলল বেশ কয়েক হাজার বছর। আস্তে আস্তে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ হতে লাগল। ক্রমশঃ



নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র

অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানুষ আরও ভালভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টায় নামল। এই চেষ্টার ফলে মানুষ এক সময় পাথরের তীর, বর্শা, ছুরি বানাতে শিখল। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে গাছের ডালকে

অস্ত্ররূপে নিল। পশুপাখীর হাড়কে পেল অস্ত্ররূপে। তীর-ধনুক ব্যবহার করে শিকার করতে শিখল আর শিকার করা তার জীবনে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন।

যত বিচিত্র রকমের অস্ত্রশস্ত্র তারা বানাতে শিখল ততই বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠতে লাগল তাদের জীবন। যেমন তীরধনুক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জন্তু-জানোয়ার শিকার করার কৌশল পালটে গেল। পশুর লম্বা হাড় দিয়ে জলের মাছ শিকার করতে অভ্যস্ত হল।

পাথরকে তারা অস্ত্ররূপে অনেকদিন আগেই নিয়েছিল। তারা ভোঁতা পাথরকে ঘষে মেজে সূঁচালো-ধারালো করে কুঠার ও অন্যান্য অনেক অস্ত্র তৈরী করতে থাকল। পাথরের এই নতুন ব্যবহারের যুগকে আমরা বলি **নতুন প্রস্তর যুগ**।

খাদ্য উৎপাদক মানুষ: বেঁচে থাকতে চাই খাবার। তাই এই খাবার সংগ্রহে মানুষের কত না চেষ্টা। কেবল ফলমূল ও পশুপাখীর মাংস খেয়ে তাদের জীবন চলত না। জলও মানুষের প্রযোজনীয় পানীয়। তাই মাছ ও পানীয় জলের জন্য নদী, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদি জলাভূমির ধারে তাদের যাতায়াত ছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখত ঐ সব জলাশয়ের ধারে নরম জমিতে বীজ পড়লে বীজ থেকে গাছ হয়, গাছ দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠে। বোধ হয় এই দেখেই মানুষ শুরু করেছিল কৃষিকাজ। মেয়েরা তাদের কুঠার দিয়ে জমি কুপিয়ে নরম মাটিতে বীজ বুনত। তখন একাজ ছিল খুবই কষ্টকর। বেশী জমি এভাবে চাষ করাও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বন্য জন্তু-জানোয়ার যেন কৃষিশস্য নষ্ট না করে সেজন্য দিনরাত জমি পাহারা দিতে হত। তাই তারা শস্য ক্ষেতের পাশে বাস করতে লাগল। নরম মাটির ধারে বাস করে মানুষ মাটি দিয়ে পাত্র বানাল। বন্য জন্তুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে ঘর গড়ল। এইভাবে উৎপন্ন ফসল তারা খেয়ে যা বাঁচতো তা ঘরে জমিয়ে রাখতো। এইভাবে খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চিত অবস্থা তারা অনেকটাই দূর করতে পারলো।

এতদিন পর্যন্ত মানুষকে খাবারের খোঁজে এক বন থেকে অন্য বনে কেবল ঘুরেই বেড়াতে হত। **এখন হল তারা খাদ্য উৎপাদক।**

নতুন প্রস্তর যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন : শুধু খাদ্য উৎপাদন করেই মানুষ ক্ষান্ত রইল না। তীর-ধনুক ও কুঠারের আবিষ্কার মানুষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। খাদ্য উৎপাদন করলেও তারা পশু শিকার বন্ধ করে নি। শিকার করতে গিয়ে তারা বনের পশুদের ধরে এনে ঘরে পোষ মানাতে লাগল। মনে করা হয় গৃহপালিত পশুদের মধ্যে কুকুরকে তারা প্রথম সাথী হিসেবে নিয়েছিল। মানুষের কাছাকাছি থেকে, তাদের খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পেয়ে কুকুর মানুষের ধারে কাছেই সদাসর্বদা থাকত। কালে কালে এরাই মানুষের শিকারে সাহায্যকারী হল। আবার বনে শিকার করতে গিয়ে তারা শূকর, ছাগল, গরু, ভেড়া ইত্যাদি জীবজন্তুকে বধ না করে নিজেদের বাসস্থানে নিয়ে এসে লালন-পালন করতে লাগল। এই পশুর মাংস তাদের খাদ্যের অভাব মেটাত। আবার তাদের চামড়া ও লোম দিয়ে তারা পোশাক বানাত।

কৃষিকাজ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র হল সরস মাটি। এটা বুঝেই তারা



নতুন প্রস্তর যুগের তৈজসপত্র

নদ-নদীর ধারে বসবাস শুরু করেছিল। এই সরস নরম মাটি দিয়ে একদিন তারা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় নানা জিনিস বানাতে

শিখল। আজও কুমোরেরা চাকের উপর নরম কাদামাটি রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাত্র বানায়। এরকম চাকও তারা একদিন আবিষ্কার করে সুন্দর এবং নানা আকৃতির পাত্র বানাতে শিখল। ঐ পাত্র রোদে শুকিয়ে ও পরে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে ব্যবহার করতে লাগল।

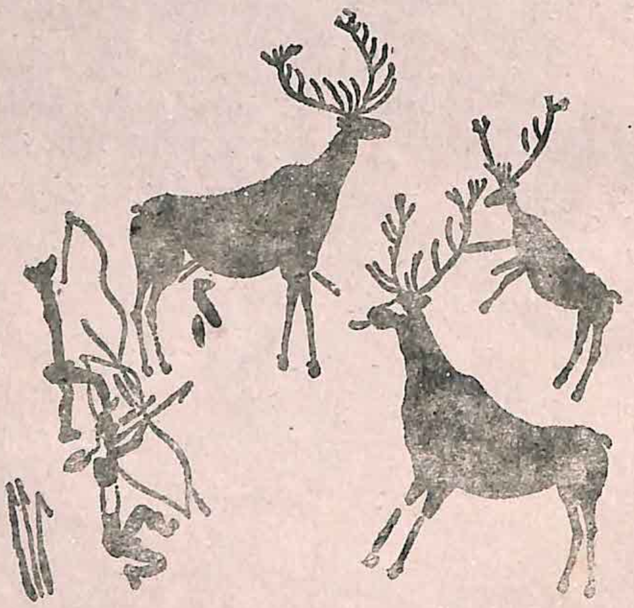
গাছের ছাল ও ভেড়াজাতীয় পশুর লোম পাকিয়ে নিজেদের পোশাক একদিন তারা বানাল। ক্রমে গাছের ছাল ও পশুলোম সূক্ষ্ম করে সুতোর মত পাকিয়ে পোশাকও তারা তৈরী করতে শিখল। তারা পশু-পাখী বা মাছের হাড় দিয়ে সূঁচজাতীয় সেলাই-বোনার যন্ত্রও তৈরী করল।

নরম কাদামাটির তৈরী ঘর তাদের সব সময় নিরাপদে রাখতে পারত না। তারা ঘরকে মজবুত করতে একদিন পাথরের পর পাথর সাজিয়ে বাসগৃহ তৈরী করল। এরকম ঘরের কি প্রয়োজন ছিল এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। সেযুগে সব মানুষই তো একদিনে কৃষিকাজ শেখেনি বা খাদ্য উৎপাদক হয়নি। তখন মানুষের নানা দল, এ বনে সে বনে, এখানে-ওখানে খাবারের খোঁজে যাযাবর জীবন যাপন করত। তারা মধ্যে মধ্যে এসে খাদ্য উৎপাদক মানুষের বসতিতে হানা দিত। নরম কাদামাটির ঘর শত্রুরা সহজেই ভেঙ্গেচুরে লুটপাঠ করত। তাছাড়া হিংস্র পশুও তাদের শত্রু ছিল। তাই আত্মরক্ষা করতে মানুষ একদিন পাথর দিয়ে শক্ত মজবুত ঘর তৈরী করল।

কৃষিকাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে যাযাবর মানুষের জীবনধারা গেল বদলে। দেখা গেল একজনের পক্ষে জমি পরিষ্কার করা, মাটি নরম করা, ফসল বোনা, জমি পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া শিকারের তাগিদ তো ছিলই। ফলে শিকার, মাছধরা বা কৃষিকাজের জন্য মানুষ একত্রিত হয়ে বসবাস করতে লাগল। তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ জন্মাল। প্রত্যেকের সাহায্য ছাড়া একাজ করে ওঠা সহজ ছিল না। তাই গড়ে উঠল গোষ্ঠী। গোষ্ঠীভুক্ত সবাই এক ভাষায় কথা বলতে লাগল। গোষ্ঠীর মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি গোষ্ঠী পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। এক এক গোষ্ঠীর লোকেরা এক এক

স্থানে বসবাস করতে লাগল। তাদের মধ্যেও আদান-প্রদান চলত দৈনন্দিন জিনিসের। ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সখ্যতা সৃষ্টি হল। এভাবে মানুষের প্রত্যেক দিনের জীবনযাত্রায় অদ্ভুত এবং অনিবার্যভাবে এসে গেল এক বিরাট পরিবর্তন।

মানুষ এখন আগুনের ব্যবহার জানে, শিকার করে, পশুপালন করে এবং ফসলও উৎপাদন করে। ফলে শুধুমাত্র খাদ্য সংগ্রহের জন্য সে আর আগের মত চিন্তিত নয়। অবসর এল তার জীবনে। ভাবতে আরম্ভ করল নানা কথা। সে পাহাড়ের গায়ে পাথর দিয়ে আঁচড় কেটে নানা পশুপাখীর ছবি আঁকতে শুরু করল। শিকারের নানা ছবিও তারা আঁকত। তাদের বিশ্বাস ছিল শিকারের আগে সেই শিকারের ছবি আঁকলে শিকার পাওয়া সহজ হয়। এমন অনেক ছবি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পেনের আলতামিরার গুহায় এমন কতকগুলো



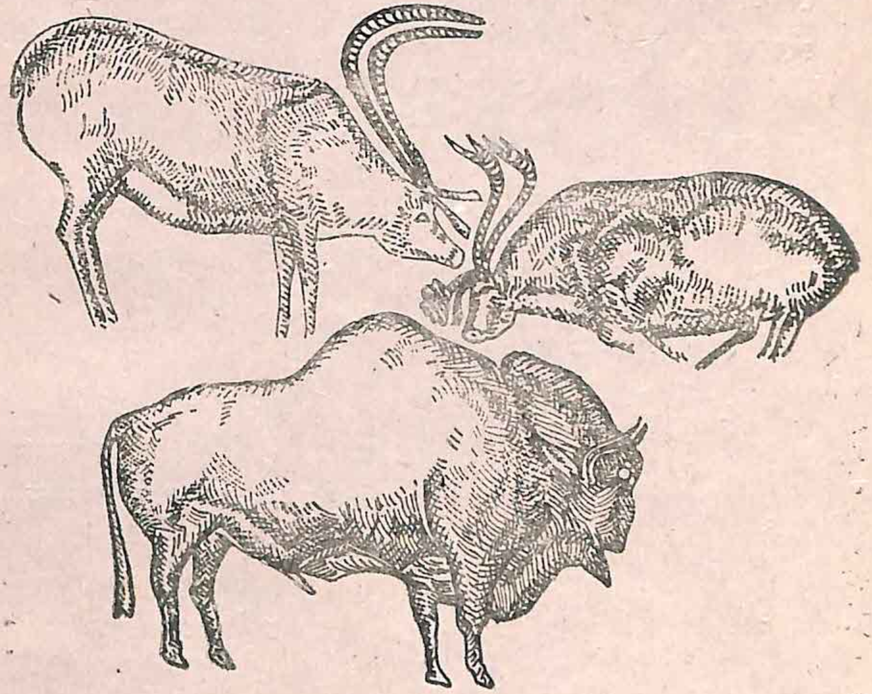
শিকারের গুহাচিত্র

বাইসনের ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। সে ছবি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। ছবিগুলো দেখে সেযুগের মানুষের শিল্পবোধের পরিচয় মেলে।

শুধু শিল্প সৃষ্টিই নয়, এই ছবিগুলোই হল মানুষের মুখের ভাষাকে লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার প্রথম চেষ্টা। এর থেকেই ক্রমশঃ চালু হয় লেখার পদ্ধতি।

এত সব কিছুর পরও মানুষ একটা জায়গায় নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল। হঠাৎ ঝড়ে বা বজ্রপাতে বাড়ী ঘর তছনছ হয়ে যায়। তারা ভয়ে মূক হয়ে থাকে। তাছাড়া নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ হলে তারা নিজেদের অসহায় বোধ করে। এমনি দুর্যোগ এলে তারা প্রথম প্রথম পালিয়ে বাঁচতে চাইত। কিন্তু পালিরে বাঁচা যায় কতদিন? নাকি পালিয়ে বাঁচা যায়?

ক্রমশঃ তারা বুঝতে চেষ্টা করল কেন এসব ঘটনা ঘটে। কিন্তু সব বুঝতে পারা তো খুব সহজ ছিল না। তাদের বোধগম্যের অতীত



আলতামিরার গুহাচিত্র

এমন ঘটনাকে তারা মনে করতে লাগল অদৃশ্য কোন শক্তিই বুঝি

সেসব ঘটাচ্ছে। তাদের কাছে যা কিছু ভয়ঙ্কর ছিল, যা কিছু ছিল তাদের বোঝার বাইরে সব কিছুকেই তারা শ্রদ্ধা করতে শিখল। যেমন সূর্যকে তারা পূজা করতে আরম্ভ করল। তারা দেখত অন্ধকার দূর হয়ে সূর্য উঠল। সূর্যকিরণে গাছপালা বেড়ে ওঠে। তাই কোন কোন জায়গায় মানুষ সূর্যকে ফসলের দেবতা ভেবে উপাসনা করতে লাগল। আবার কোন কোন গোষ্ঠীর মানুষ মনে করত মৃত পূর্ব-পুরুষেরা সদয় হলে তারা মানুষের উপকার করে। অনেকে মনে করত মাতামহী ফসলের দেবী। এভাবে নানা গোষ্ঠীর মানুষ নানা জনকে ফসলের দেবী ভাবত। তবে একথা ঠিক যে ভয়-ভীতি ও প্রীতি থেকেই আদিম সমাজে দেবতার আরাধনা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই মানুষের জীবনে এল ধর্ম। তারা যা কিছু বুঝতে পারত না তাই দেবতা ঘটাচ্ছে বলে নির্বিবাদে মেনে নিত। এতে মানবসমাজে ক্ষতিই হয়েছিল।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

শিম্পাঞ্জীদের মতই ছিল আদিম মানুষ। বনের ফলমূল আর কাঁচা মাংস খেয়ে যে মানুষের জীবন কাটত, আগুনের ব্যবহার তার জীবনে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন। তারপর কৃষিকাজ শিখে মানুষ শুধু খাদ্য উৎপাদনই করতে শিখল না, তার প্রত্যেক দিনের জীবনও হয়ে উঠল অনেক সভ্য।

অনুশীলনী

(ক) **রচনামূলক প্রশ্ন :—**

১। আদিম মানুষের পরিবর্তন সম্পর্কে পণ্ডিতেরা কি কি অনুমান করেছেন ?

২। আদিম মানুষেরা প্রথম কোথায় বাস করত ? তখন তাদের খাদ্য কি ছিল ? তারা কাঁচা মাংস খেতে আরম্ভ করে কখন ?

৩। কোথাকার মানুষ প্রথম আগুন ব্যবহার করতে শেখে বলে অনুমান করা হয় ? এমন অনুমানের কারণ কি ? আগুন মানুষের জীবনে কি কি পরিবর্তন নিয়ে এল ?

৪। নতুন প্রস্তর যুগে কি কি পরিবর্তন এল ?

৫। আদিম মানুষের মনে ধর্মবোধ এল কিভাবে ?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। মানুষ প্রথমে কি কি দিয়ে অস্ত্র বানায় ?
২। মানুষ কিভাবে চাষ আবাদ করতে শিখল ?
৩। মানুষ কাকে শস্যদায়িনী দেবতা হিসেবে জ্ঞান করত ?
৪। আদিম যুগে মানুষের লেখার পদ্ধতি কি ছিল ?
৫। আদিম মানুষেরা ছবি আঁকত কোথায় ?
৬। আদিম মানুষেরা শিকারের ছবি আঁকত কেন ?
৭। মানুষেরা গোষ্ঠী গড়ে তোলে কখন ?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
অ) আদিম মানুষ প্রথম বসতি স্থাপন করে — ।
আ) মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হল — আবিষ্কারের ফলে।
ই) স্পেনের — গুহায় আদিম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে।
ঈ) মানুষের প্রথম পোষা জীব হল -- ।
উ) মানুষ — জন্য পাথরের ঘর বানাতে আরম্ভ করে।

২। নীচের বাঁদিকের বক্তব্যকে ডানদিকের বক্তব্যের সঙ্গে মেলাও :—

অ) মানুষ বর্শা কুঠার হাতুড়ি বানাল	অ) পশুপালন শুরু করে।
আ) মানুষ কাঁচা মাংস খেত	আ) পুরানো প্রস্তর যুগে।
ই) নতুন প্রস্তর যুগের মানুষেরা	ই) পশু শিকার করে খেত।
ঈ) পুরানো প্রস্তর যুগের মানুষেরা	ঈ) নতুন প্রস্তর যুগে।

৩। নীচে দেওয়া ঠিক বাক্যের পাশে 'হ্যাঁ', এবং ভুল বাক্যের পাশে 'না' লিখ :—
অ) নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখে।
আ) ভয় থেকেই মানুষের মনে এল ধর্মভাব।
ই) পুরানো প্রস্তর যুগ মানুষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।
ঈ) ছবি এঁকেই মানুষ প্রথম মনের ভাব প্রকাশ করে।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১) আদিম মানুষেরা সূর্যের পূজা করত কেন ?
২) মানুষ খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহী হল কেন ?
৩) খাদ্যের চিন্তা না থাকায় মানুষ জীবনে কি পেল ?
৪) প্রাচীন গোষ্ঠী পরিচালনা করতেন কে ?
৫) কি দিয়ে আদিম মানুষেরা পোষাক বানাত ?
৬) কোন্ যুগকে নতুন প্রস্তর যুগ বলে ?

(ঙ কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। কোন যাদুঘরে বেড়াতে গিয়ে সেখানে আদিম জীবজন্তুর কংকাল দেখ এবং তাদের পরিচয় সংগ্রহ কর।
২। পাঠ্য বইয়ের ছবি দেখে মাটি দিয়ে আদিম যুগের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী কর।

২

তৃতীয় অধ্যায়

তামা-ব্রোঞ্জের যুগ ঃ | **পাঠবিন্যাস ঃ** (১) শহরের প্রয়োজন (২) সামাজিক পরিবর্তন ও উপজাতীয় দ্বন্দ্ব (৩) নদী-উপত্যকার সভ্যতা বিকাশের কারণ

বিষয়-সংকেত ঃ মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্যই হল, মানুষ কখনোই অল্পে তুষ্ট নয়। তাই একদা পশুর মত থাকলেও মানুষ সর্বক্ষণ নিজের জীবনধারাকে পালটে নেয়। এই পালটানোর চেষ্টা কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল এবারে আমরা তাই জানবো।

শহরের প্রয়োজন ঃ মানুষ পাথর ব্যবহার করতে করতে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল তামা নামে এক ধাতু। এই ধাতু আগুনে না পুড়িয়ে শুধু পিটিয়ে বা কেটে নিয়ে মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিস বানাতে লাগল। পরে তামা আগুনে পুড়িয়ে ছাঁচে ঢেলে জিনিস তৈরীর পদ্ধতি মানুষই আবিষ্কার করেছিল।

তামা একটা এমন নরম ধাতু যা দিয়ে ভাল যন্ত্রপাতি, শক্ত মজবুত অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা যায় না। শুধু তামার জিনিসপত্র তৈরী করতে গিয়ে মানুষ সম্ভবত তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে একপ্রকার নতুন শক্ত ধাতু তৈরী করল। তৈরী মিশ্র ধাতুর নাম হল ব্রোঞ্জ।

ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে অনেক শক্ত ও মজবুত। তা দিয়ে মানুষ তৈরী করতে লাগল চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি, নিত্য ব্যবহারের তৈজসপত্র, যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি।

যেমন পাথরের ব্যবহারের যুগকে আমরা প্রস্তর যুগ বলি তেমনি তামা ও ব্রোঞ্জ যখন থেকে সমাজে ব্যবহৃত হতে লাগল তখন শুরু হল তামা-ব্রোঞ্জের যুগ।

ধাতুর ব্যবহার শুরু হলেও সমাজ থেকে পাথরের ব্যবহার উঠে গেল না। কারণ সে সময় ধাতু সহজে পাওয়া যেত না। এ ধাতু কেবল ধনীরা ব্যবহার করত। তাই তামা-ব্রোঞ্জ যুগ শুরু হলেও পাথরের ব্যবহার সে যুগেও ছিল। সকলের পক্ষে তামা-ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না।

তামার ব্যবহার শুরু হওয়ায় জিনিসপত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় এল এক অভিনব পরিবর্তন। মানুষ এতদিন দল গঠন করে গ্রামেই বাস করছিল। যত দিন যেতে লাগল মানুষের প্রয়োজন বাড়তে লাগল। প্রয়োজনের তাগিদে এক এক দল মানুষ এক এক রকম কাজ করতে শুরু করল। কেউ বানাতে লাগল তৈজসপত্র, কেউ বানাতে লাগল অস্ত্রশস্ত্র। আবার কেউ কেউ তামার খোঁজে ছুটতে লাগল দূরদূরান্তে। এমনিভাবে সমাজে হল এক এক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ। যেমন, যারা চাষ-আবাদ করতে লাগল তারা হল চাষী বা কৃষক। যারা তুলো থেকে কাপড় তৈরী করতে লাগল তারা হল তাঁতী। যারা অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র বানাতে লাগল তারা হল কামার ইত্যাদি।

মানুষ একা তার প্রয়োজনীয় জিনিস সব তৈরী করতে পারে না। তাই মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করবার জন্য একে অন্যের কাছে গেল। চাষী তার উৎপন্ন জিনিস দিয়ে তাঁতীর কাছ থেকে কাপড় নিতে লাগল, কামার তার অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে চাইল চাষীর কাছে খাবার। এইভাবে সে সময়ে সমাজে বিনিময় প্রথায় গড়ে উঠল ব্যবসা। তখনও টাকা-পয়সা আবিষ্কার হয়নি। মানুষ প্রথম যুগে বিনিময় প্রথায় ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

এই বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষের মনে জাগল এক বুদ্ধি। মানুষ ভাবল এমনিভাবে জিনিসের বিনিময় করতে বড় সময় লাগে। বিভিন্ন বৃত্তির লোকের কাছে যাতায়াত করতে হয়, কষ্ট করে দূরদূরান্তে যেতে হয়। তাই একদিন মানুষ সুবিধা বুঝে, নানা জিনিস সংগ্রহ করে তা সাজিয়ে নদীর ধারে এক জায়গায় এসে বসল। সেসব স্থানে পাওয়া যেতে লাগল মানুষের প্রয়োজনের সব জিনিস। জিনিস নেবার ও দেবার জন্য সেখানে বহু লোকের সমাগম হতে লাগল। শিল্পী-কারিগরেরা সেই দেওয়া-নেওয়ার গঞ্জের ধারে-কাছে বাস করতে লাগল। এভাবে গঞ্জের রূপ পরিবর্তন হতে থাকল। নদীর ধারে গঞ্জ হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে নৌকো করে এক দেশের মানুষ অন্য দেশে মালপত্র আনা-নেওয়া করতে শুরু

করল। এরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠল। মানুষের হাতে ক্রমশঃ সম্পদ এল। গঞ্জের চেহারা বদলে গঞ্জ হল একদিন শহর।

তাই বলা যায়, মানুষ একদিন প্রয়োজনের তাগিদে নদ-নদীর তীরে শহর গড়ে তুলল। ভাবা যায়,—ভারত, মিশর, মেসোপটেমিয়া চীন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যদেশের শহরগুলো নদ-নদী তীরে এভাবেই গড়ে উঠেছিল।

সামাজিক পরিবর্তন ও উপজাতীয় দ্বন্দ্ব : ধাতু ব্যবহারের ফলে মানব সমাজে এল এক বিরাট পরিবর্তন। ধাতু ব্যবহারের আগে মানব সমাজে সমস্ত কিছুতে ছিল সমান অধিকার। সে সমাজে আমার তোমার বলে কোন স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল না। দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ই বড় ছিল। কোন সম্পত্তিতে কোন একজন মানুষের নিজস্ব মালিকানা স্বত্ব ছিল না। উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে যা কিছু ছিল তাতে সকলের ছিল সমান অধিকার।

আদিম অবস্থায় দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে করতে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সে যুগে গোষ্ঠীয় স্বার্থ কায়েম করার জন্য এক গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব লেগে থাকত। হেরে যাওয়া গোষ্ঠীর সব কিছু বিজয়ী দল ভোগ করত। এমন কি বিজিত দলের লোকজনেরা বিজয়ী দলের দাসে পরিণত হত। দাসরা বিজয়ী দলের সমাজে সমস্ত রকম কাজকর্ম করতে বাধ্য থাকত। কাজে অবহেলা হলে তারা কঠোর শাস্তি পেত। এইভাবে সমাজে সৃষ্টি হল দুটি সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণী—প্রভু ও দাস। এই দাস শ্রেণীর লোকেরা গরীব মেহনতী মানুষে পরিণত হল। আর প্রভুর দল পরিণত হল ধনী সম্প্রদায়ে। এই ধনী সম্প্রদায় আরও বেশী ধন-সম্পদের লোভে যুদ্ধে লিপ্ত হল। গোষ্ঠীকে রক্ষা করা, গোষ্ঠীর সকল লোককে সংযত করা, বশে রাখার জন্য গোষ্ঠীপতি একদিন রাজার আসনে বসল। এরূপে সমাজে রাজতন্ত্রের সূচনা হল।

সে সময় রাজা ছিলেন দেশের সর্বময় কর্তা। তিনি হতেন একাধারে বিচারক, সেনাপতি ও প্রধান পুরোহিত।

নদী-উপত্যকায় সভ্যতা বিকাশের কারণ ঃ মানুষ যেদিন থেকে পশুপালন করতে শিখেছিল সেদিন থেকে পশুর খাদ্যের সংস্থানে এক-স্থান থেকে আর একস্থানে যেতে বাধ্য হত। সাধারণত এসব গবাদি পশু ছিল তৃণভোজী। তাই তৃণের সন্ধানে মানুষ জলাশয়ের ধারেই যাতায়াত করত বেশী। নদী-উপত্যকায় তৃণ হত বেশী। তাই তারা নদী-উপত্যকায় যাযাবরের মত গবাদি পশু নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে নদীতীরের সরস মাটিতে তারা একদিন ফসল ফলাল। তখন থেকে ফসলকে পশুপাখীর হাত থেকে বাঁচাতে ঘর বাঁধল নদীতীরে। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে তারা জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করল। নদী থেকে খাল কেটে এই জলের প্রয়োজন তারা মেটাতে লাগল। নদীতীরে নরম মাটি নিয়ে তা দিয়ে তারা ঘর বানাল। তাছাড়া নদীপথে যাতায়াত ছিল স্থলপথ অপেক্ষা অনেক নিরাপদ। তাই যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধের জন্যও তারা নদীতীরে বাস করা শ্রেয় বিবেচনা করল। নদীতীরেই আরম্ভ হয় নানাস্থানের জিনিসের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা।

এভাবে মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল পৃথিবীর বিখ্যাত নদ-নদী উপত্যকায়। ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকায়, মিশরের নীলনদের তীরে, চীনে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর ধারে আর মেসোপটেমিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কূলে প্রথম সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ হয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

প্রস্তর যুগের পর আরম্ভ হয় ধাতুর যুগ। মানুষের প্রথম পরিচিত ধাতু হল তামা। তারপর মানুষ তৈরী করে ব্রোঞ্জ। ধাতু ব্যবহার থেকেই মানব সমাজে এল নগর-গঠন, শিল্প-প্রতিষ্ঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজের শ্রেণীভেদ, গোষ্ঠী-বিরোধ ও রাষ্ট্রগঠন।

অনুশীলনী

(ক) **রচনামূলক প্রশ্ন ঃ—**

১। তামার ব্যবহার শুরু হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হল?

২। বিনিময় প্রথা কাকে বলে? কেন এই প্রথা প্রচলিত হয়? কখন এই প্রথা প্রচলিত হয়!

৩। নদীর উপত্যকা অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল কি কি কারণে?

৪। ধাতু যুগে সমাজে প্রভু ও দাস—এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হল কিভাবে?

৫। ধাতু যুগে পেশাভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে কেন?

(খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—**

১। কোন কোন ধাতুর সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরী হয়?

২। ধাতু যুগে কিভাবে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়?

৩। তখন রাজার কি কি দায়িত্ব ছিল?

৪। ধাতুর ব্যবহারের আগে মানুষের সমাজ কেমন ছিল?

৫। বিনিময় প্রথার প্রয়োজন হয় কেন?

(গ) **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

১। নীচের বাক্যগুলোর প্রত্যেকটির পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া সঠিক কথাটির নীচে দাগ দাও :—

(ক) এই যুগে প্রথম শহর গড়ে ওঠে—(প্রস্তর যুগে, তামার যুগে, লোহার যুগে)

(খ) তামা ব্রোঞ্জযুগে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল—(উৎপন্ন দ্রব্য, টাকা, সোনা)

(গ) ভারতে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠে—(সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়)

(ঘ) মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়—(পাহাড়ে, বনে, নদীর ধারে)

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) — তামার চেয়ে অনেক শক্ত ও মজবুত।

(খ) টাকার অভাবে ধাতু যুগে ব্যবসা চলতো — প্রথার মাধ্যমে।

(গ) যাতায়াতের অসুবিধের জন্য ব্যবসা আরম্ভ হল —।

(ঘ) মিশরের — তীরে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

(ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন :—**

১। কোন ধাতুর সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় হয়?

২। মানুষ কিভাবে ব্রোঞ্জ তৈরী করে?

৩। ধাতুর ব্যবহারের ফলে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন এল কেন?

৪। ধাতুর ব্যবহারের ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল কেন?

৫। পশুপালন করার পর থেকেই মানুষকে অনবরত একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হত কেন?

———

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ : (১) মেসোপটেমিয়া (২) মিশর (৩) সিন্ধু উপত্যকা (৪) চীন

একঃ মেসোপটেমিয়া

পাঠবিন্যাস : (১) অবস্থান ও প্রাচীনত্ব (২) বন্যা ও চাষ-আবাদ (৩) জীবনযাত্রা (৪) সুমারের অবদান

বিষয়-সংকেত : মানুষ জীবনধারা পালটানোর চেষ্টা থেকেই গড়ে তুলল নিজেদের সভ্যতা। সবচেয়ে অবাক করা কথা হল, প্রাচীনকালে এ রকম চারটি সভ্যতা চারটি বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে তুললেও তাদের মধ্যে ছিল এক চমৎকার মিল। কেমন সে মিল এবারে আমরা তাই খুঁজবো।

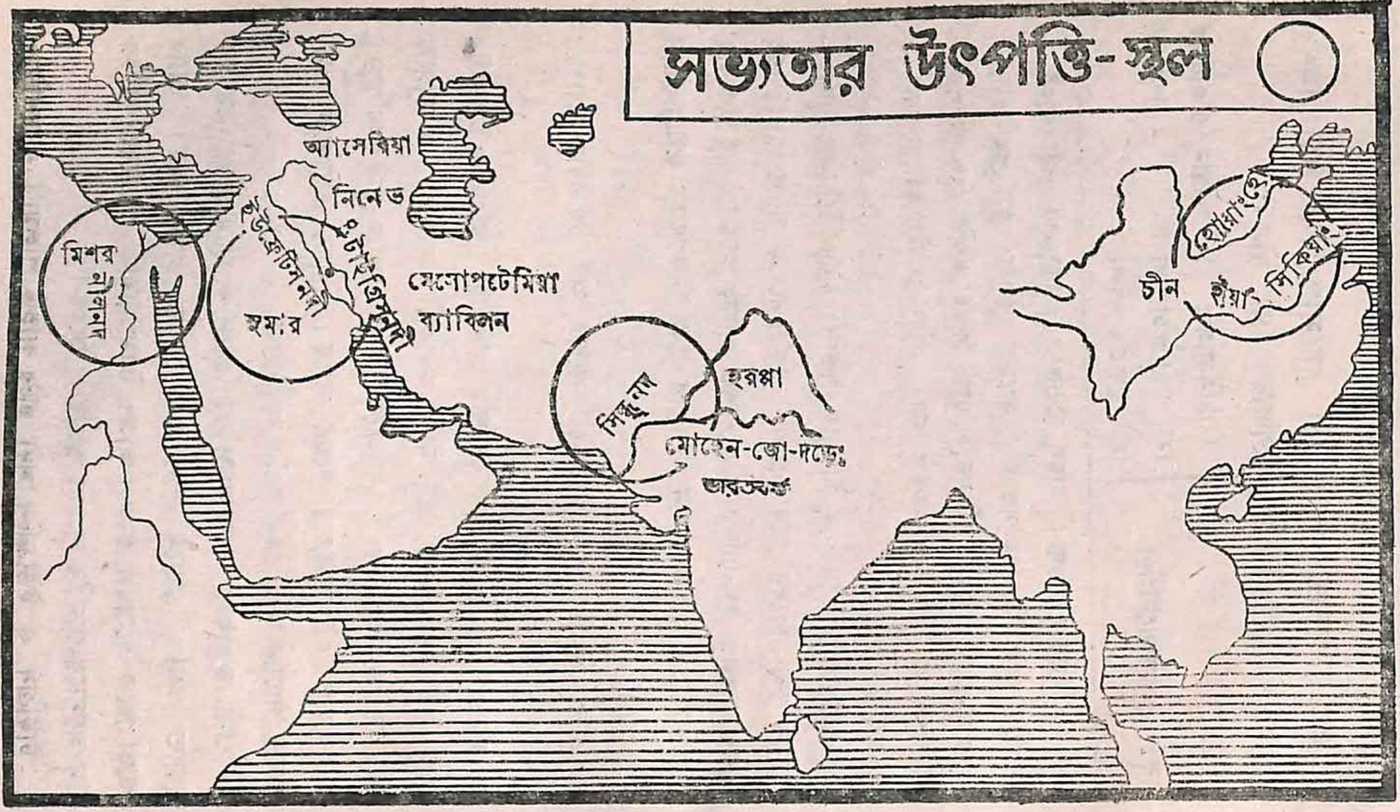
প্রাচীনকালে যে সব যায়গায় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এশিয়া-মাইনর হল তাদের মধ্যে প্রথম একথা বলেন পণ্ডিতেরা। এই এশিয়া-মাইনর হল এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশ। এই অঞ্চলের মেসোপটেমিয়া নামক স্থানে সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় বলে অনুমান করা হয়।

গ্রীক ভাষায় 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান।

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব : পশ্চিম এশিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নামে দুটি নদী আছে এই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভূ-ভাগকে বলা হত মেসোপটেমিয়া। বর্তমানে এস্থানে ইরাক রাষ্ট্র অবস্থিত। বাইবেলেও এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে। তাতে এস্থানকে বলা হয়েছে 'গার্ডেন অব ইডেন' অর্থাৎ স্বর্গউদ্যান।

প্রায় ছ'হাজার বছর আগে সুমারিয়ান বা সুমেরিয়ান নামে এক অর্ধসভ্য জাতি এস্থানে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করে। তারা কোথা থেকে এসেছিল একথা আজও জানা যায়নি। তাদের জাতির নাম অনুসারে স্থানটির নাম হয় সুমার বা সুমের।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটির বাহিত পলিমাটি এ দেশটিকে গড়েছে। প্রতি বছর বন্যার ফলে এর দুপাশের অঞ্চল হত প্লাবিত।


সভ্যতার উৎপত্তি-স্থল
মিশর
অ্যাসেরিয়া
নিনেভ
মেসোপটেমিয়া
ব্যাবিলন
সুমার
হরপ্পা
মোহেন-জো-দড়ো
ভারতবর্ষ
চীন

তাই এ অঞ্চলটি ছিল জলকাদায় ভরা। সুমারিয়ানরা এসে এ স্থানের জল নিকাশ করে দেশে কৃষিকাজ করতে থাকে। ফলে সেখানে প্রচুর ফসল ফলতে থাকে। প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল থাকায় এখানে সভ্যতার দ্রুত প্রসার হতে থাকে। সুমারিয়ানরা নরম মাটি দিয়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে, মন্দির তৈরী করে এক নতুন সভ্যতার সূচনা করে।

মেসোপটেমিয়ায় সে সময় যেসব নগর ছিল তাদের মধ্যে উর, লারসা, লাগাশ, এরেক, এরিডু ছিল প্রধান।

এই নগরগুলোতে এক একটি পৃথক শাসন ব্যবস্থা ছিল। নগরে নগরে চলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মারামারি, যুদ্ধ। তারা শান্তিতে থাকতে জানত না।

যুদ্ধবিগ্রহ করলেও তারা নানাদিক দিয়ে উন্নতি করে। দেশটি পাহাড় ঘেরা না হওয়ায় বারবার নানা উপজাতির লোকেরা ধনসম্পদের আশায় হানা দিয়েছে। এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে আকাডিয়ান উপজাতির নেতা সারগণ মেসোপটেমিয়ার প্রায় সমগ্র অঞ্চল দখল করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। তারা এদেশ অধিকার করলেও সুমারের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সারগণকে প্রথম বিজয়ী নেতা আখ্যা দেওয়া হয়।

বন্যা ও চাষ-আবাদ: নদীবাহিত পলিমাটিতে গড়া দেশটি ছিল চরম উর্বর। তবে প্রতি বছর ঐ দুটি নদীতে বন্যা হওয়ায় দেশ ভেসে যেত। ঘর-বাড়ি শস্যক্ষেত ডুবে সুমারিয়ানদের ক্ষতি হত প্রচুর। তাই তারা প্রথমে বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ বাঁধল। খাল কেটে জলসেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করল। ফলে বন্যার জলধারাকে বশে আনা গেল। বাঁধ বাঁধতে যে পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল তা তারা নদীপথে দূরদেশ থেকেই বয়ে আনত। কারণ কাদামাটির বাঁধ তত টেকসই মজবুত হতে পারে না। সেটা উপলব্ধি করেই তারা পাথর দিয়েই বাঁধ বেঁধেছিল। সে যুগে বর্তমানের মত


ম্যাসিডোনিয়া
কৃষ্ণসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
এশিয়া
গ্রীস
লেডিয়া
এশিয়া মাইনর
সার্ডিস
মেসোপোটেমিয়া
নিনেভ
সাইপ্রাস
সিরিয়া
আসুর
ক্রীট
টেয়ার
আক্কাদ
ব্যাবিলন
সুসা
জেরুজালেম
সুমের
উর
মেম্ফিস
পারস্য
আফ্রিকা
পারস্য উপসাগর
আখেটেটন
সাহারা
থিবস্
লোহিত সাগর
আরব
ভূ ম ধ্য সা গ র

মেসোপোটেমিয়া অঞ্চল

যন্ত্রপাতি না থাকলেও হাজার হাজার দেশবাসীর সহযোগিতায় একাজ সম্ভব হয়েছিল। বন্যাকে তারা প্রতিরোধ করেছিল।

মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখে বোঝা যায় তারা সাধারণত উঁচু জায়গায় বাড়িঘর তৈরী করত।

দেশের মানুষ চাষী ছিল ভাল। তারা বার্লি, গম ইত্যাদি চাষে উৎপন্ন করত। প্রথম অবস্থায় দেশের জলকাদা মাটিতে নলখাগড়া ও খেজুর গাছ জন্মাত প্রচুর। জলনিকাশ ও জলসেচ করে উর্বর মাটিতে সোনার ফসল তারা এখানে ফলাতে সক্ষম হল।

জীবনযাত্রাঃ প্রথমে কৃষিকাজ ছিল সুমারিয়ানদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষক ছাড়া এদেশে একশ্রেণীর ভূমিহীন মানুষও ছিল। তারা ধনী কৃষকদের অধীনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। সুমারিয়ানদের সঙ্গে অন্যদেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকত। তাই জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ সৈন্যবিভাগে কাজ করত। এদেশের একশ্রেণীর লোক তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করত। আবার অনেকে দেশের উৎপন্ন জিনিস নিয়ে অপর দেশ থেকে তামা, টিন ইত্যাদি ধাতু নিয়ে আসত। এদেশের অধিবাসীরা সে যুগেই শাল, কার্পেট ও পশমের কাপড় তৈরী করতে জানত। সোনা ও পশুর হাড় দিয়ে তারা নানা অলংকারও তৈরী করত। কুমোরের চাকের সাহায্যে মাটির পাত্রও তারা তৈরী করত। এসব পাত্রে রং-তুলি দিয়ে নক্সা আঁকত এক শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর লোক কাঠ দিয়ে চেয়ার, টুল বানাত। তারা ইট তৈরী করে তা দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর বানাত। মন্দির, দেবালয় তৈরী করত। এরূপ শিল্পকাজও তাদের জীবিকার অন্য উপায় ছিল। মেয়ে কারিগররা সুতো কাটত, তাঁত চালাত এবং ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরী করত। এ থেকে বোঝা যায়, সুমারের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কাজ করত।

সুমারের বেশ কিছু জমিদার শ্রেণীর লোক ছিল। তাছাড়া ছিল পুরোহিত নামে এক সম্মানীয় পণ্ডিত শ্রেণীর লোক। জমিদারেরা

প্রাসাদ তৈরী করে বাস করত আর পুরোরোহিতেরা থাকত মন্দিরে। প্রাসাদ ও মন্দিরের চারপাশে থাকত কারিগর ও মজুরের দল।

তারা নানা দেব-দেবীর পূজো করত। দেবী বাউ ছিলেন তাদের প্রিয়। জানা গিয়েছে সেই দেবীর মন্দিরের পুরোহিতের অনেক কর্মচারী ছিল।

পুরোহিত শ্রেণীর লোকদের সে সময় সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বেশী। কারণ প্রাচীনকালে প্রতিদেশেই মানুষ অজ্ঞানতা-বশতঃ নানা দেব-দেবীর কল্পনা করত। আর বুদ্ধিমান শ্রেণী পুরোহিত সেজে তাদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে নিজেরা প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াত। তবে এই পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান ছিল। তারা লেখাপড়ার চর্চা করত। সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে তাদেরও দান কম নয়।

সুমারের অবদান : মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুমারিয়ানদের কৃতিত্ব স্মরণীয়। তাদের দানে প্রাচীন সভ্যতা বহুদূর এগিয়ে যায়! তাদের সেদিনের নানা আবিষ্কার আমরা আজও বর্তমান সমাজে মেনে চলেছি।

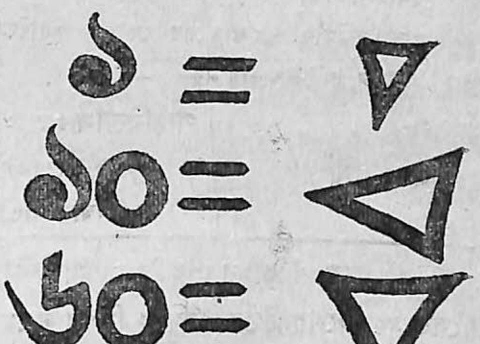
ষাট সেকেণ্ডে মিনিট, ষাট মিনিটে ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন রাত; এই সময় গণনা রীতি তারাই প্রথম আবিষ্কার করে। একটি বৃত্তের কেন্দ্র যে ৩৬০ ডিগ্রীতে বিভক্ত তা তাদেরই আবিষ্কার। বারমাসে বছর, তিরিশ দিনে মাস হিসেব সুমারিয়ানরাই ঠিক করেছিল। জ্যোতির্বিদ্যাতেও তারা সুপণ্ডিত ছিল। তারা হিসেব করে কবে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে তা বলে দিতে পারত। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের হিসেব করে তারা মানুষের ভাগ্য গণনাও করতে পারত। মালপত্র ওজনের জন্য এক জাতীয় বাটখারাও তারা ব্যবহার করত। বেচা-কেনার মাধ্যম হিসেবে তারা রূপোর পাতকে টাকা, পয়সা হিসেবে ব্যবহার করত।

মন্দির বানানোও তাদের কীর্তি। তারা দেবতার মন্দির বানাত ইট দিয়ে। সেই মন্দিরকে তারা বলত জিগুরাত। জিগুরাত হল প্রকাণ্ড বাড়ি। তাতে ঘর থাকত অসংখ্য। এই মন্দিরসংলগ্ন

থাকত বিদ্যালয়। মন্দির এবং ধনীদের প্রাসাদ তৈরী করতে গিয়ে তারা বাড়ির ছাদ ও খিলান রীতিও প্রচলন করে। তাছাড়া সুন্দর নক্সা ও ছবি এঁকে তারা মন্দির ও বড় বড় বাড়ির দেওয়াল চিত্রিত করত। তাদের দেশে পাথর না থাকায় তারা পাথর আনত সিরিয়া থেকে। পাথর কুঁদে সুন্দর সুন্দর মূর্তিও তারা তৈরী করত। এরূপ মূর্তি তাদের মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুমারের মানুষরা ধাতুবিদ্যাতে ওস্তাদ ছিল। তারা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপো ইত্যাদি ধাতু দিয়ে নানা অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে জানত।

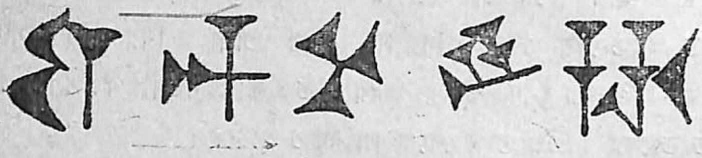
যাতায়াতের জন্য তারা এক ধরনের চাকাওয়ালা গাড়ি আবিষ্কার করে। রথের প্রচলনও তাদের মধ্যে ছিল। নৌ-বিদ্যাতেও তারা পারদর্শী ছিল। নৌকো করে তারা দূর দূর দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তারা মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ব্যবসায়ে তারা নিজ দেশ থেকে খাদ্যশস্য, পশমের জামা-কাপড়, জুতো নিয়ে যেত এবং অপর দেশ থেকে তারা নিজের দেশে নিয়ে আসত সোনা, রূপো, তামা, টিন, হীরা, নানারকম পাথর ইত্যাদি।



সুমারের সংখ্যালিখন

সুমারের লোকেরা ভাল লেখাপড়া জানত। তারা এক ধরনের লিপি আবিষ্কার করেছিল। এ লিপিকে বলে কিউনিফর্ম। বাংলায় এর নাম কীলকাক্ষর। অক্ষরগুলো দেখতে ছিল মাথা মোটা পেরেকের মত। তাদের সময়ে কাগজ ছিল না। তারা লিখত কাঁচা মাটির তৈরী টালির ওপর। তারপর তা আগুনে পুড়িয়ে বা

রোদে শুকিয়ে নিত। এরূপে তারা বই পর্যন্ত রচনা করে গিয়েছে। এমন একখানা বই লণ্ডনের যাদুঘরে আজও আছে।



কীলকাক্ষর

তারা সংখ্যা লেখার পদ্ধতিও আবিষ্কার করে। ১, ১০ ও ৬০ এই তিনটি অংকের সাহায্যে তারা গণিতের যাবতীয় হিসেব করত। তাই বলা যায়, সুমারের অবদান ইতিহাসে বিরাট এক অবদান।

● এই সভ্যতা সম্পর্কে মনে রাখার কথা ●

সুমার সভ্যতা হল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। বৎসর গণনার পদ্ধতি, মন্দির নির্মাণ ও হস্তাক্ষরের কৌশল আবিষ্কারই হল এই সভ্যতার এমন অবদান, যা ভোলবার নয়।

দুই : মিশর

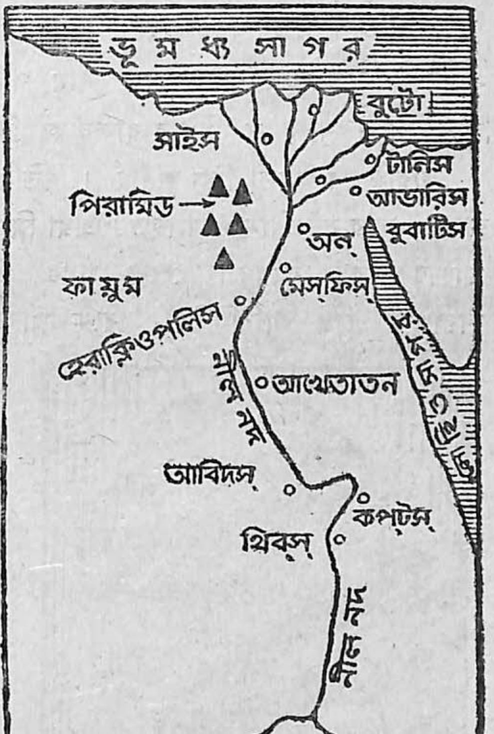
পাঠবিন্যাস : (১) অবস্থান ও ভূমির প্রকৃতি (২) জনজীবন (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য (৪) পিরামিড (৫) ধর্মবিশ্বাস (৬) প্রধান প্রধান বৃত্তি

অবস্থান ও ভূমির প্রকৃতি : আফ্রিকা নামে এক মহাদেশ আছে। সেই মহাদেশের উত্তর-পূর্বদিকে মিশর নামে একটি দেশ রয়েছে। দেশটি মরুভূমি ঘেরা। তার মাঝখান দিয়ে চলেছে নীল নদ। তাই চারদিকে মরুভূমি থাকলেও এই নদীর জন্যই মিশরের কতক অংশ সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। এই দেশকেই এখন ইংরাজীতে বলে 'ইজিপ্ট'।

আফ্রিকা মহাদেশের এক উঁচু পাহাড় থেকে নীল নদের উৎপত্তি। এই নদী গিয়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে। বর্ষার সময় তার জলধারা দুকুল ছাপিয়ে আশে-পাশের সমস্ত জায়গা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অপর সময় এই নদীর জল শান্তভাবে বহে চলে। পাশের জায়গাগুলো বর্ষার জল পেয়ে উর্বর হয়ে ওঠে। তাই সেখানে ফসল ফলে প্রচুর। এজন্য নীল নদকে লোকে বলে 'মিশরের প্রাণ'। এই নীল নদ না থাকলে মিশরও হত উষর মরুভূমি।

জনজীবন ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরের নীল নদের দুপাশে লোক এসে বাস করতে শুরু করে। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাযাবরের মত পশুর দল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ফসল ফলাতে শিখে তারা গ্রাম গড়ে নীল নদের তীরে স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধল। তাদেরই বংশধরেরা হাজার-হাজার বছর ধরে এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে তোলে। এ সভ্যতাকে বলে মিশরীয় সভ্যতা।

মিশরের মানুষদের কাছে মিশর দেশটাই ছিল গোটা জগৎ। তারা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকত যে জগতের আর কিছুর খোঁজ খবর রাখত না। তারা নিজেদের বলত 'বে মি'। 'বে মি' কথার অর্থ হল—নীল নদের তীরের মানুষ। মাটির তলা থেকে প্রাচীন মানুষের কংকাল পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিতেরা তা দেখে অনুমান করেন এই মানুষরা প্রায় ষোল হাজার বছর আগে বাস করত। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এদেশে চাষ-আবাদ শুরু হয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।



মিশরসভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্র

সে সময় মিশর ছিল ছোট-বড় নানা ক্ষুদ্র রাজ্য। নীল নদের জল নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। এসব অসুবিধে দূর করতে একদিন ঐ সব ছোট-বড় রাজ্যগুলো মিশে এক ঐক্যবদ্ধ মিশর রাজ্য গড়ে তোলে। সেদিন থেকে শুরু হয় মিশরের রাজতন্ত্র। মিশরের সর্বপ্রথম রাজার নাম মেনেস। তিনি তাঁর রাজধানীর নাম রাখেন মেমফিস নগরী।

এদেশের রাজাকে বলা হত 'ফারাও'। ফারাও কথাটির অর্থ হল যিনি বড় বাড়িতে বাস করেন। মিশরবাসী রাজাকে দেবতাস্থানে সম্মান জানাত। তারা রাজার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করত না। অনেকগুলো রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করেছিল।

ফারাওদের ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি হতেন একদিকে দেশের রাজা আবার সর্বপ্রধান পুরোহিত। তাঁরা মিশরে নীলনদের বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। দেশে পাথর পাওয়া যায় না। তাই ফারাওরা সুদূর আবিসিনিয়া থেকে পাথর এনে নীল নদে বাঁধ বাঁধেন। শুধু বাঁধ নয় বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে বিরাট বিরাট পিরামিড তৈরী করেন; পিরামিড হল ফারাওদের কবর।


দ্বিতীয় রামেসিস

মিশরে বিভিন্ন রাজ বংশের যেসব ফারাওরা রাজত্ব করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন—খুফু, আমেন হোটেপ, নেকো, থুথমিস, সেটি, রামেসিস প্রভৃতি। দ্বিতীয় রামেসিসকে 'মহামতি রামেসিস' বলা হয়। কারণ তিনি

ছিলেন যেমন যোদ্ধা তেমনি দেশনির্মাতা। তাঁর আমলে মিশরের বড় বড় সৌধগুলো নির্মিত হয়েছিল।

মিশরের ফারাও-রা থাকতেন রাজধানীতে। মিশরের অন্যান্য নগরীগুলোও ছিল বিখ্যাত। প্রতিটি নগরীতে থাকতেন নগর দেবতা। নগর দেবতার মন্দির দেখাশোনা করতেন পুরোহিতেরা। এই পুরোহিতেরা ছিলেন নগরের সর্বেসর্বা। সমাজে এই পুরোহিতদের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাঁরা মন্দিরের সঙ্গে বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে লেখাপড়া শেখাতেন। তাঁরা চিকিৎসক, গণক ও শারীরবিশারদ ছিলেন। এই পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন শিক্ষিত। তাই শিক্ষার যাবতীয় কাজ তাঁরাই করতেন। শুধু জনজীবনে নয়, ফারাও-দের উপরও তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতেন। ফারাও-কে দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করাতেন পরজন্মের কথা। তাঁরা মন্ত্রতন্ত্রকে রোগ সারাবার দাওয়াই হিসেবেও ব্যবহার করতেন। এমনকি গ্রহ নক্ষত্রের খবরও তাঁরা রাখতেন। মিশরের প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে অনেক লিপি পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য এই লিপি থেকে জানা যায়। সেই প্রাচীন লিপিকে ইংরাজীতে বলে 'হেয়ারোগ্নোফিক'। বাংলায় এর নাম চিত্রলেখা। কতকগুলো ছবির সাহায্যে এই লেখা চলত। তাই তার এরূপ নাম হয়েছে। এই লেখা মিশরের পুরোহিত শ্রেণীর দান।

আমাদের সকলের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ঐ লিপি কিভাবে পাঠ করা সম্ভব হল। কিছুদিন আগে শঁম্পালিয়ে নামে এক ফরাসী পণ্ডিত এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। ফরাসী দেশের সৈনিকেরা 'রোসেটা' নামে এক জায়গা থেকে একটা শিলালিপি নিয়ে আসে। এই লিপিটি তিনটি ভাষায় লেখা ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল গ্রীকভাষায়। পণ্ডিত শঁম্পালিয়ে গ্রীকভাষা জানতেন। ফলে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। অবশ্য এর জন্য ঐ পণ্ডিতকে সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরিশ্রম করতে হয়। প্রথম প্রথম পুরোহিতেরা এই

লেখা লিখলেও পরে ঐ দেশে পেশাদার লেখক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাঁরা রাজকার্যে ও ব্যবসা বাণিজ্যে ঐ লিপি ব্যবহার করতেন।

শুধু পাথরের ওপরই তাঁরা লিখতেন না। মিশর দেশে পেপিরাস নামে নলখাগড়া জাতীয় একরকম ঘাস থেকে কাগজ তৈরী হয়।



হেয়ারোগ্নোফিক লিপি

এই কাগজ লম্বা হত এবং তা গুটিয়ে রাখা যেত। তার ওপরে জল ও আঠার সঙ্গে ঝুল-কালি মিশিয়ে কালি তৈরী করে খাগের কলম দিয়ে তাঁরা লিখতেন! এই পেপিরাস কথাটি থেকেই কাগজের ইংরাজী শব্দ 'পেপার' কথাটি এসেছে।

নীল নদের জল নিয়ে মিশরের লোকজনদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ লেগে থাকত। তার ওপর বর্ষার নীল নদের জলে দেশের সব জমিজমা ভেসে গিয়ে জমির সীমানাকেও ধুয়ে মুছে দিয়ে যেত ফলে জমির পরিমাণ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি শুরু হত। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য একদল নেতৃস্থানীয় মানুষ এগিয়ে এলেন। তাঁরা মাপ-জোখ করে জমির সীমানা ঠিক করে দিতেন। এভাবে মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কমে গেল। এর জন্য জমির মালিকেরা নেতৃস্থানীয়দের উৎপন্ন ফসলের এক অংশ দিতেন। এভাবেই অবশেষে একদিন পেশাদার কর আদায়কারীর দল সৃষ্টি হল।

মিশরের সমাজে ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর লোকই ছিল। আর ক্রীতদাস নামে একশ্রেণীর মানুষ ছিল—যারা সমাজে যাবতীয়

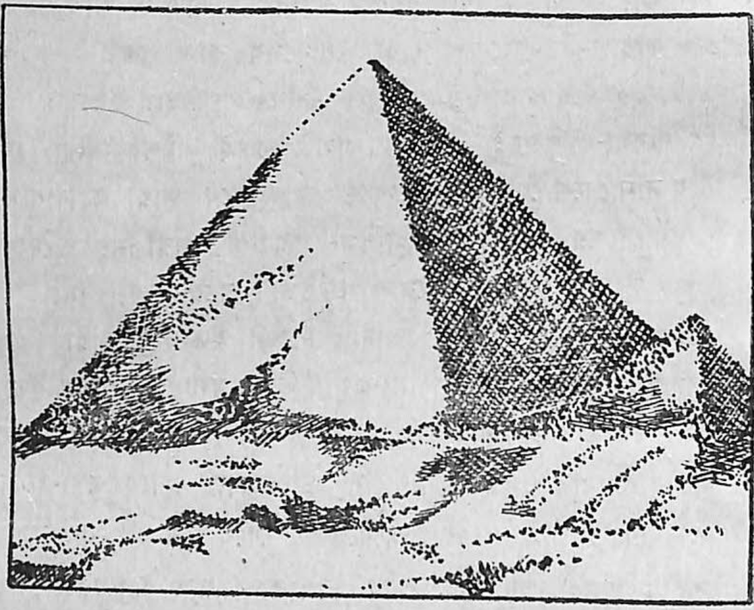
পরিশ্রমের কাজ করত। দেশের উচ্চশ্রেণীর মানুষরা কোন কাজই করত না। তারা শ্রমিক, মজুর ও ক্রীতদাসদের দিয়ে যাবতীয় কাজ-কর্ম করিয়ে নিত। কৃষকরা ক্ষেতে ফসল ফলাত। আবার দরকার হলে ফারাও-এর আদেশে তারাই সৈনিকের কাজ করত। কৃষকদের বিদ্রোহের ভয়ে ফারাও-রা ভাড়াটে সৈনিকও ব্যবহার করতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ প্রাচীন কাল থেকেই মিশরবাসীরা নৌকা নিয়ে নানাদেশে যেত ব্যবসা করতে। জলপথে তারা ভূমধ্যসাগরের তীরের দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তারা নিজের দেশে যে তুলো উৎপন্ন করত তা দিয়ে কাপড় তৈরী করে বিদেশে নিয়ে যেত। এছাড়া নানারকম কাচের জিনিস, চামড়া ইত্যাদিও তারা বিদেশে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে সোনা-রূপো, তামা, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি আনত। তাছাড়া তারা কাঠের নানা দ্রব্য তৈরী করত। তাও তাদের ব্যবসার সামগ্রী ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় মোহেন্-জো-দড়োতে এমন একটা টুল পাওয়া গিয়েছে তা দেখে মনে হয় সেটি মিশরের তৈরী। তাই বলা যায় সুদূর ভারতের সঙ্গেও তাদের সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

পিরামিড ঃ প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম হল মিশরের পিরামিড। সে যুগে বিরাট পাথরের তৈরী এরূপ উঁচু কবর সত্যই এক বিস্ময়।

গ্রীক ভাষায় পিরামিড শব্দের অর্থ খুব উঁচু। এই পিরামিড তৈরী হত মিশরের ফারাও-দের কবরের ওপর। আর এই কবর ফারাওগণ জীবিতকালেই তৈরী করিয়ে রাখতেন! সেই ফারাও-এর মৃত্যু হলে তাঁর দেহটিকে মমি করে ঐ পিরামিডের গুপ্তকক্ষে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হত। আর যুগ যুগ ধরে মাটির ওপরে জেগে থাকত ঐ পাথরের তিনকোণা সুউচ্চ পিরামিড। পিরামিডের গুপ্ত কক্ষের মধ্যে থাকত মৃত ফারাও-এর জীবিতকালের যাবতীয় প্রিয় জিনিসপত্র সোনাদানা, অলংকার ইত্যাদি। এমন কি তাঁর প্রিয় খাদ্যদ্রব্যও ঐ কবরের গুপ্তকক্ষে রেখে দেওয়া হত।

সে যুগে মিশরের অধিবাসীদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর জীবন আছে। তাই সে জীবনে চলার জন্য যাবতীয় পাথেয় মৃতের কবরে



পিরামিড

রেখে দেওয়া হত। তাছাড়া তারা মৃতদেহটি যেন নষ্ট না হয় তার জন্য নানা ভেষজ দিয়ে মৃতদেহটিকে অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করত। এই ভেষজ মাখান মৃত দেহটিকে বলা হয় মমি। কোলকাতার যাদুঘরে এমন একটি মমি আজও দেখা যায়। এরূপ করার কারণ হল তাদের এক অদ্ভুত ধর্মীয় বিশ্বাস। তারা মনে করত মৃত আত্মা পুনরায় ঐ দেহে প্রবেশ করবে। যদি দেহটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আত্মা কিভাবে তার মধ্যে প্রবেশ করবে? তাইতো মৃতদেহকে অবিকৃত রাখার জন্য তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আর মৃতদেহটি রাখবার বাক্সটি হত কারুকার্যময় সোনাদানায় মোড়া এক বিলাসবহুল সামগ্রী।

পিরামিড সে যুগে যে কত তৈরী হয়েছিল তা কেউ আজ পর্যন্ত

বলতে পারে না। অজস্র ক্রীতদাস, মজুর ও শিল্পীর কঠোর শ্রমের সাক্ষী হয়ে আজও আশিটি পিরামিড দেখা যায় মিশর দেশে। সেই পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পিরামিড হল কায়রোর কাছে গীজে অবস্থিত ফারাও কুফুর সমাধি মন্দির। প্রায় তের একর জমির ওপর কয়েক তালগাছ উঁচু এই পিরামিড। সর্বপ্রাচীন পিরামিড হল ফারাও জোসেফের কবরের ওপর নির্মিত। এটি কায়রোর দক্ষিণে সাককারায় অবস্থিত। বর্তমান যুগে ফারাও টুটেনখামেনের কবরটি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই কবর থেকে তাঁর মাম ও প্রিয় জিনিসপত্র দেখে এযুগের মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছে। কি বিলাসবহুল জীবন ছিল ফারাও-দের তার নমুনা টুটেনখামেনের সমাধিমন্দির।



মমি

এরূপ পিরামিড তৈরী করতে লাগত লক্ষ লক্ষ টন পাথরের চাঁই। কত হাজার হাজার কর্মী, শিল্পী বছরের পর বছর ধরে একটি পিরামিড তৈরী করত। এই সব কর্মী ও শিল্পীদের মধ্যে যারা পিরামিডের গুপ্তধন রাখার গুপ্তকক্ষ নির্মাণ করত পিরামিড তৈরী হলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হত। তার কারণ আর কিছু নয়, পাছে তারা গুপ্তকক্ষের খবর অন্যের কাছে বলে দেয় এবং তার জন্য গুপ্তকক্ষ থেকে ঐসব ধনরত্ন চুরি হয়ে যায়। অবশ্য পরবর্তী যুগে ঐসব পিরামিডের গুপ্তধন অপহৃত হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত ফারাও টুটেনখামেনের কবরটিই অটুট ছিল, তা চোরে সন্ধান করতে পারেনি।

ধর্মবিশ্বাস : মিশরের অধিবাসীরা নানা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা

করত। এসব দেবদেবীর মধ্যে 'রা', 'অ্যামন', 'ওসাইরিস' ছিলেন প্রধান। অনেক সময় তারা বিড়াল, কুমীর ভেড়া, জলহস্তী ইত্যাদি জীবজন্তুকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। মিশরীয়রা মনে করত মৃত্যুর পর মানুষের রয়েছে অনন্ত জীবন। তাই সেই জীবনের সুখ-শান্তির জন্য জীবিতকালে সবকিছু তারা গুছিয়ে রাখত কবরের মধ্যে।



ওসাইরিস



দেবতা 'রা'

প্রধান প্রধান বৃত্তি ঃ প্রাচীন মিশরের সমাজ ছিল মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত। এক দলে ছিলেন ফারাও, পুরোহিত ও সামন্ত শ্রেণীর অভিজাতরা আর অন্যদলে ছিল ক্রীতদাস, দিনমজুর, কারিগর ও শিল্পীর দল। ফারাও ছিলেন দেশের রাজা ও সর্বোচ্চ পুরোহিত। আর পুরোহিত ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকেরা বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকতেন। তাঁরাই দেশের লোকের মনে আজগুবি ধর্মবিশ্বাসকে নানা যুক্তি দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখতেন। এমন কি পুরোহিত-পণ্ডিত শ্রেণীর মানুষরা ফারাও-এর মনোরঞ্জন করতেন নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড করে আর না-হয় অনাগত ভবিষ্যতের বিষয় বলে। অবশ্য এই পুরোহিত-পণ্ডিত শ্রেণীর মানুষরা জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতি নিয়ে চর্চা করতেন।

এ ছাড়া মিশরের অভিজাত শ্রেণীর আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে যারা সব কিছু জোগাত তারা হল ক্রীতদাস, মজুর-শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণীর লোক। মিশরের ক্রীতদাসরাই সমাজের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ করত। তাদের মিশরীয়রা বলত 'জীবন্ত-মৃত'! এরূপ জীবন্ত

মৃতের বহু ছবি পিরামিডের গায়ে খোদাই করা আছে। কারিগর শিল্পীরা অভিজাতশ্রেণীর আদেশ অনুসারে জীবনভোর কাজ করে যেত। এতটুকু আনন্দ বা অবসর করবার তাদের জীবনে উপায় ছিল না। তাদের ওপর খবরদারী করবার লোক থাকত পিছনে। কাজে গাফলতি করলে তখনই চাবুক পড়ত পিঠে, না হয় পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেওয়া হত কঠোর। এত কাজ করেও কারিগর-শিল্পীরা তাদের সংসারে স্ত্রী-পুত্রদের পেটভরে খেতে দিতে পারত না। এই ছিল সে যুগে মিশরের সমাজ চিত্র।

●এই সভ্যতা সম্পর্কে মনে রাখার কথা●

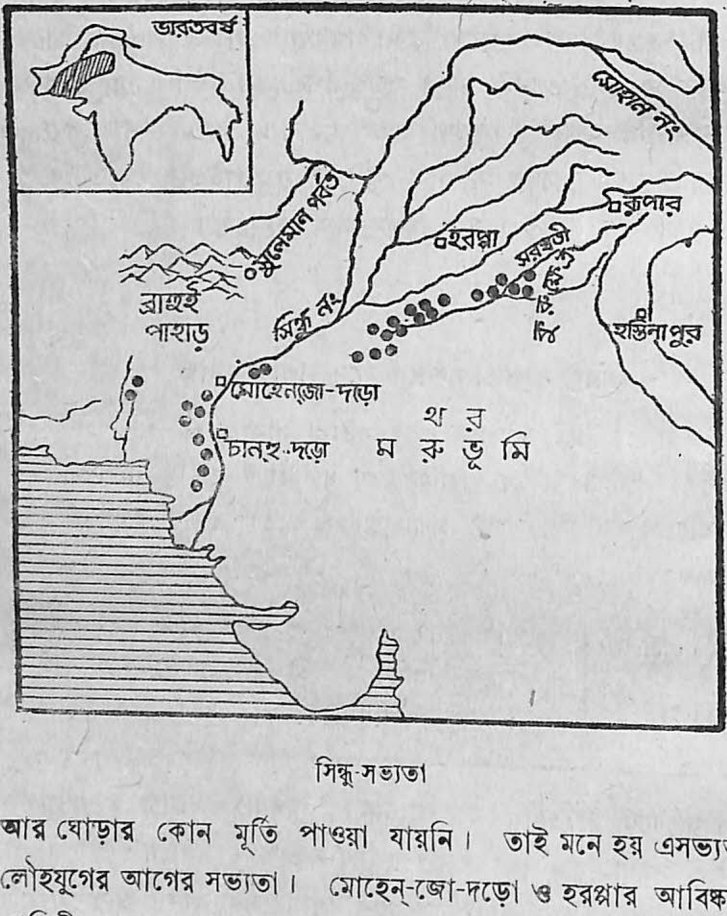
স্থায়িত্বে এবং অবদানে মিশর সভ্যতা মানবজাতির এক বিরাট সম্পদ। পৃথিবীর বিস্ময় পিরামিড এই সভ্যতারই সৃষ্টি। প্যাপিরাস জাতীয় কাগজ মিশরীয়রাই প্রথম ব্যবহার করে। হস্তলিপিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

তিন ঃ সিন্ধু-সভ্যতা

পাঠবিন্যাস ঃ (১) শহর পরিকল্পনা (২) খাদ্য ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র (৩) শিল্প-বাণিজ্য (৪) দেব-দেবতা (৫) সমাজে শ্রেণীভেদ

ভারতবর্ষের ইতিহাস বহু প্রাচীন। পৃথিবীর অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতার সমসাময়িক হল ভারতের সিন্ধু-সভ্যতা। আগে লোকের ধারণা ছিল যে, আর্যজাতির ভারতে আগমনের ফলে ভারতবর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল ; কিন্তু কয়েক বছর আগে, সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে সিন্ধুনদের পাশাপাশি অঞ্চলে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আজ পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় চল্লিশটি বসতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটো বসতি হল মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পা। সিন্ধু নদের

ধারে এর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে এসভ্যতার নাম সিন্ধু-সভ্যতা। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পায় লোহার কোন জিনিস পাওয়া যায়নি



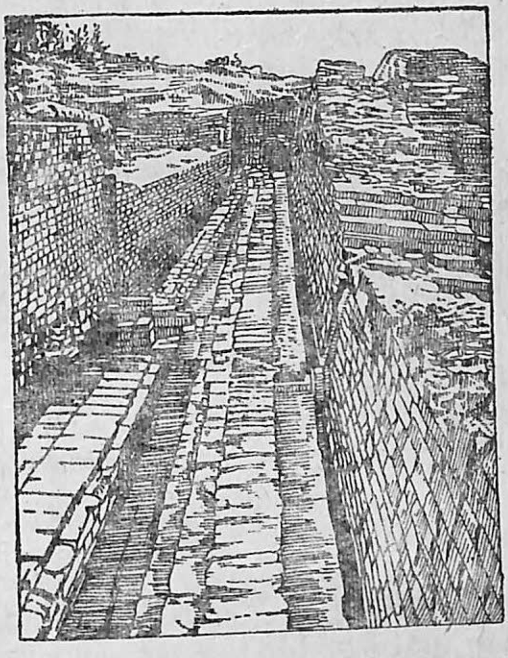
সিন্ধু-সভ্যতা

আর ঘোড়ার কোন মূর্তি পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় এসভ্যতা লৌহযুগের আগের সভ্যতা। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কার কাহিনী বড় চমৎকার।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তখন রেললাইন পাতার কাজ চলছে। তারজন্য দরকার হল পাথর। এই পাথর সংগ্রহের জন্য সিন্ধুনদের ধারে হরপ্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো-তে পাওয়া গেল প্রচুর পাথর। সেই পাথর সংগ্রহ করতে ঐ স্থানে আরম্ভ হল খনন কাজ। মাটি খুঁড়ে পাথর সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হল ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হরপ্পা নগরী। স্থানীয় কথায় 'মোহেন্-জো-দড়ো' কথার অর্থ

'মৃতের স্তূপ'। একথায় সন্দিহান হয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা একদিন ঐ মৃতের স্তূপ খুঁড়ে মাটির তলায় কি আছে জানতে চান। ফলে আবিষ্কৃত হয় মোহেন্-জো-দড়ো।

পাঞ্জাবের একটা নদীর নাম ইরাবতী। এই নদীর ধারে অবস্থিত হল হরপ্পা। বর্তমানে এই স্থান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলায় পড়েছে। এই হরপ্পা নগরী আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানী নামে এক ভারতীয় পণ্ডিত। ঠিক সেই রকম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে লারকানা জেলার মধ্যে মোহেন্-জো-দড়ো নামক এক স্থান

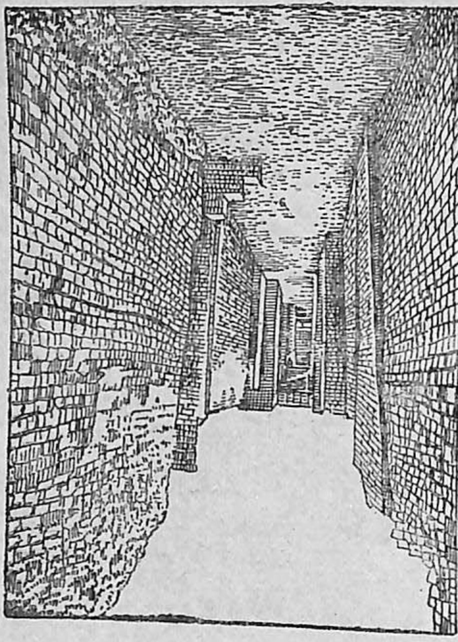


মোহেন্ জো-দড়োর নর্দমাসহ ইট বাঁধানো পথ

খুঁড়ে একটি প্রচীন সভ্যতার নিদর্শন মিলল। এই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালী পণ্ডিত।

ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট বলেন—এসভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি সমাজ সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ছিল।

শহর পরিকল্পনা : সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ভারতে নগর রাষ্ট্রগুলো আজও মানুষের মনে বিস্ময় জাগায়। মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় এসব জায়গায় ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, শস্যাগার, নালা-নর্দমা পরিকল্পনা মত তৈরী করা হত। নগরের



মোহেন্‌জো-দড়ো : সরু গলি পথ

একদিকে থাকত দুর্গ ও সভা-সমিতি বসবার স্থান। বাড়ির দূষিত জল পথের ধারের নর্দমায় এসে পড়ত এবং এই নর্দমা মাটির তলা দিয়ে দূষিত জল বয়ে নিয়ে যেত। রাস্তার পাশে বাড়িগুলো ছিল বহুতলবিশিষ্ট। তারা ইট দিয়ে ঘর বানাত। ঘরের মেঝে ও দেওয়ালে আস্তরণ দেওয়া হত। প্রত্যেক বাড়িতে রান্নাঘর, স্নানের ঘর, জলের জন্য কুয়ো ছিল। সাধারণের স্নানের জন্য মোহেন-জো-দড়োতে এক বিরাট স্নানাগার পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া একটা বড় প্রাসাদ ও একটা লম্বা হলঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। বড় বাড়ির দেওয়ালে নকসা কাটা দেখা যায়। তাছাড়া হরপ্পায়

পাওয়া গিয়েছে বিরাট এক শস্যাগার। এই শস্যাগারের পাশে থুপড়ি জাতীয় কুটীরও দেখা গিয়েছে।

এসব ছাড়া ঐ দুটি স্থানে খুঁড়ে তখনকার দিনের মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, তৈরী মূর্তি, সীলমোহর ইত্যাদি নানা জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

খাদ্য ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র: ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত নানা জিনিস দেখে বোঝা যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা যব, গম আর খেজুর খেত। তাছাড়া নানা শাকসব্জী, ফল, দুধ, মাছ-মাংস ইত্যাদি খেত বলেও ধারণা করা হয়। ভেড়া, ছাগল, শূকর, মুরগীর মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। এমনকি শুট্‌কি মাছ ও কচ্ছপের মাংস খেত বলেও অনুমান করা হয়।

মোহেন্-জো-দড়োর লোকেরা কার্পাস তুলো এবং পশমের তৈরী জামাকাপড় ব্যবহার করত। তাদের আমলের কোন কাপড়-জামা পাওয়া যায়নি সত্য তবে তাদের তৈরী পুতুলের পোষাক দেখে মনে



সিন্ধু-সভ্যতার অলঙ্কার

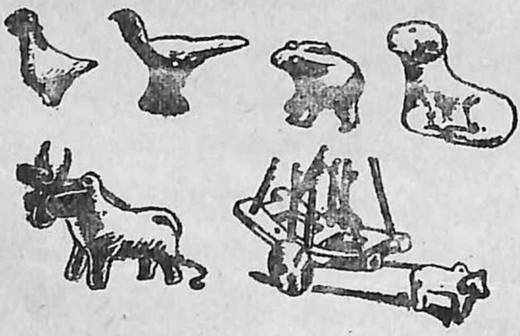
হয় তারা কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত এক খণ্ড এবং দেহের ওপরের অংশের জন্য আর এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করত। সেযুগে স্ত্রী-পুরুষ দুজনে অলংকার পরত বলে মনে হয়। সেসময় গহনা তৈরী হত সোনা, রূপো, তামা প্রভৃতি ধাতু দিয়ে। তাছাড়া মূল্যবান পাথর ও হাতীর দাঁতের গহনাও তারা ব্যবহার করত। তারা যে কেশ-

বিন্যাস করত এবং প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করত তার প্রমাণ হয় আবিষ্কৃত আয়না-চিরুনি থেকে। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই চুল রাখত। পুরুষেরা গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখত। এখানে পাওয়া ভগ্ন মূর্তি থেকে তাই মনে হয়।



মোহেন্-জো-দড়ো : পাথরের মূর্তি

দৈনন্দিন কাজের জন্য তারা মাটি, তামা, রূপো, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দিয়ে বিভিন্ন রকম বাসনকোসন তৈরী করে ব্যবহার করত। তাদের ব্যবহৃত থালা, বাটি, মগ, ক্ষুর, কাস্তে, মাছধরার বঁড়শি প্রভৃতি ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গিয়েছে। কাঠের তৈরী খাট বা চারপায়া দেখে মনে হয় তাও সেযুগে ব্যবহার করা হত। শুধু বড়দের জন্যই নানা জিনিস তৈরী হত না। ছোটদের জন্যও সে যুগে ঝুমঝুমি, মাটির তৈরী নানা



সিন্ধু-সভ্যতার খেলনা

খেলনা, গাড়ি, মূর্তি ইত্যাদি বানান হত। এরূপ অনেক খেলনা ঐসব ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গিয়েছে নানারূপ সীল-মোহর ও অস্ত্রশস্ত্র। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বর্শা, তীর-ধনুক, তলোয়ার, কুঠার, ছড়ি প্রধান।

উন্নতমানের এসব দেখে সেযুগে ভারতেও যে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিল্প-বাণিজ্য ঃ সিন্ধু-সভ্যতার যুগে এখানকার মানুষ কুমোরের চাক আবিষ্কার করে মাটির নানা ধরনের পাত্র তৈরী করত। তার ওপর তারা নানা নকসা আঁকত। রং তুলি দিয়েও সে সব পাত্র চিত্রিত করা হত। এমন ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরো ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গিয়েছে। তা দেখে সে যুগের মানুষের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া নানাবিধ মূর্তি, অলংকারও সে যুগের শিল্পমনের পরিচায়ক।

নানারূপ সীলমোহর দেখে মনে হয় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে এই সীলমোহর ব্যবহৃত হত। সুদূর মিশর ও সুমার অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ব্যবসা চলত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ঐসব দেশের সঙ্গে তাদের জলপথে ব্যবসা চলত। তাছাড়া আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সঙ্গে তাদের স্থলপথে ব্যবসা চলত বলে মনে হয়। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তারা দক্ষিণ ভারত থেকে মূল্যবান পাথর আনত। তারা তুলোর বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করত। বিদেশ থেকে তারা তামা ও ব্রোঞ্জ আমদানি করত। সিন্ধু-উপত্যকার শহরগুলো ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। মোহেন্-জো-দড়োর রাস্তার দুপাশে বাজার বসত বলে মনে হয়। বিদেশীরা সে বাজার থেকে নানা জিনিস কিনত।

দেব-দেবতা ঃ সিন্ধু-উপত্যকায় কোন দেবদেবীর মন্দির মেলেনি। তা থেকে অনুমান করা হয় এ অঞ্চলের মানুষ নানা প্রকৃতি দেবীকে অর্চনা করত। তবে তাদের সীলমোহরে মাতৃকা মূর্তি দেখা যায়। এথেকে মনে করা যায় তারা মাতৃকা দেবীর পূজা করত। একটি সীলমোহরে এক যোগী মূর্তি ও কতকগুলো

পশুমূর্তি খোদাই দেখা যায়। এই যোগী মূর্তি বর্তমানের পশুপতি-দেবের মূর্তির মত। তা থেকে মনে হয় তাদের এই দেবতাই পরে শিব-মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।



পশুপতিদেবের মূর্তি

যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তারা মৃতদেহ সংকার করত ছুটি উপায়ে। দাহ করে মৃতের চিতাভস্ম তারা রেখে দিত। আবার মৃতদেহকে কবর দেবার রীতিও সে সময় প্রচলিত ছিল।

সামাজিক ব্যবস্থা : সে যুগের সমাজজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও বলা যায়, সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা এক সুখী-সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করত। তাদের সভ্যতা ছিল শহরকেন্দ্রিক। কতকাল ধরে যে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা বলা যায় না। তবে সেযুগে শহরে ধনী-দরিদ্র, ব্যবসায়ী সকলে যে বাস করত তার প্রমাণ হল ঘরবাড়ির পার্থক্য। ধ্বংসস্তূপ থেকে কুটীরজাতীয় ও প্রাসাদোপম দুরকম গৃহই দেখা গিয়েছে। শহরের গঠন দেখে মনে হয় শহরের পরিচালন ব্যবস্থা বিত্তবানদের হাতেই থাকত। এই সমাজ ব্যবস্থায় সুমার ও মিশরের মত পুরোহিত শ্রেণীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

সিন্ধু-সভ্যতার কথা বললে অনেকে মনে করেন বুঝি হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো এ দুটি স্থানেই এসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরও অনেক ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে এই সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানে ও সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

এসব স্থানে খুঁড়ে সিন্ধু-সভ্যতার অনেক কথা জানা গেলেও পুরোপুরি সে সভ্যতা সম্বন্ধে এখনো জানা যায়নি। কারণ ঐ সময়ের লিপি আজও পর্যন্ত পাঠোদ্ধার হয়নি। ঐ লিপি পাঠ করা যেদিন সম্ভব হবে সেদিন ঐ সভ্যতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই জানা যাবে।

●এই সভ্যতা সম্পর্কে মনে রাখার কথা●

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ। সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এর অপূর্ব নগর নির্মাণ কৌশল। সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধার দিকে তখন এত সতর্কতা ছিল যে তা আজও আমাদের অবাক করে দেয়। এই সভ্যতার লোকেরা কিন্তু লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না।

চার : চীন

পাঠবিন্যাস : (১) হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী-উপত্যকা (২) বন্যা প্রতিরোধ

প্রাচীন সভ্যতার জন্য যে সব দেশ বিখ্যাত চীন তাদের মধ্যে অন্যতম। চীনদেশের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রাচীনকালে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী-উপত্যকা : উত্তর চীনের সুবিশাল সমতল ভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে হোয়াংহো নদী। আর মধ্য চীনের সমতল ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ইয়াংসিকিয়াং নদী। এই নদী দুটির মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জলধারা এই নদী দুটির মধ্যভাগের ভূমিকে করেছে উর্বর, শস্যশ্যামল। এই উর্বর সমতল ভূমিকেই সে যুগে মানুষ বেছে নিয়েছিল তাদের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে।

প্রায় তিন লক্ষ বছর আগেও চীনে যে মানুষ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে তারা ছিল প্রস্তর যুগের মানুষ। আর এই

নদী দুটির মাঝে যারা বাস করত তারা ছিল প্রাচীন যুগে এক সভ্য মানুষ।

চীনের ইতিহাসের প্রথম দিকের কথা বিশেষ জানা যায় নি। তবে চীন দেশের যে সব উপকথা প্রচলিত আছে তা থেকে প্রাচীন যুগের এক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তারা কৃষি ও শিল্প জানত। রেশমগুটি পালন ও রেশমবস্ত্র তৈরী করতে শিখেছিল। তারা প্রাচীনকাল থেকেই লিখতে জানত।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীনের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরাই তৈরী করে নিত। তারা তামা, সোনা, রূপো ইত্যাদির ব্যবহার জানত।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, ব্রহ্মা এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন। চীনদেশেও তেমনি প্রচলিত উপকথায় আছে যে এই বিশ্বজগতে প্রথমে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী বলে কিছুই ছিল না। সে সময় পানকু নামে এক অতিমানব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আঠারো হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। চীনা ভাষায় 'পানকু' শব্দের অর্থ 'প্রথম মানুষ'। উপকথায় আছে পানকু চন্দ্র-গ্রহ-তারা ও সূর্য আকাশ, বজ্র, বায়ূ ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এমনকি পৃথিবীতে যত জীব তাও তাঁর সৃষ্টি। তাতে বলা আছে পানকু মারা গেলে তাঁর মাথা থেকে সৃষ্টি হয় পাহাড়-পর্বত, তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয় মেঘ ও বায়ু, গলার আওয়াজ থেকে সৃষ্টি হয় বজ্র আর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি হয় তাঁর দেহের অণুপরমাণু থেকে।

বন্যা প্রতিরোধ : চীনদেশের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী উপত্যকায় প্রতিবছর বন্যা আসতো এবং বন্যায় চীনের ঐ সমতলভূমি ধুয়ে মুছে যেত। ফলে ঐ অঞ্চলের লোকের দুঃখকষ্টের অবধি থাকত না। এই দুঃখকষ্টের লাঘব করেন চীনের এক রাজা। তাঁর নাম 'উ'। তিনি 'মহান উ' নামে পরিচিত। রাজা 'উ' নদীতে বাঁধ বেঁধে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। তিনি একদিকে বন্যা

প্রতিরোধ করেন অপর দিকে এ অঞ্চলের বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে, বন্য জন্তুদের তাড়িয়ে দিয়ে মানুষের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করেন। আর কৃষিকাজের সুবিধের জন্য তিনিই জলসেচ ব্যবস্থা করে সেযুগে একজন প্রসিদ্ধ রাজা হন।

● এই সভ্যতা সম্পর্কে মনে রাখার কথা ●

দূরত্ব এবং প্রাকৃতিক বাধার জন্য চীনের সভ্যতা সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তাই এই সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের অনেক বেশী অনুমানের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আবার সেই সব অনুমানের মূল উৎস হল নানা রকমের উপকথা ও রূপকথা।

নদীতীরবর্তী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য :

পাঠবিন্যাস : (১) সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রগুলো সবই নদী-উপত্যকায় দেখা যায়। সুমার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীতীরে, নীল নদের উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা। সিন্ধু নদের উপত্যকায় ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হতে দেখা যায়। আর চীন দেশের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীতীরে গড়ে উঠতে দেখা যায় চীন-সভ্যতা।

এখন স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে, কেন নদীতীরে প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। নিশ্চয় তখন নদীতীরই সভ্যতা গড়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই নদীতীরে সহজলভ্য ও সুবিধাজনক। নদী-উপত্যকার সরস ও উর্বর মৃত্তিকায় শস্য ফলে বেশী। নদীতীরের সরস মাটি-ঘর গড়তে ও পাত্র বানাতে বিশেষ সহায়ক। নদীর জল খালকেটে চাষ-আবাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য

করা সহজ ছিল। পালিত পশুর ঘাসজাতীয় খাদ্য নদী-উপত্যকায় পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। পানীয় জল এবং জলজ প্রাণী মানুষের খাদ্যদ্রব্যের অভাব মেটায়।

তাই বলা যায় সেসময় মানুষের যা প্রয়োজন তার বহুল অংশ নদী-উপত্যকাই পূরণ করেছিল। সে কারণেই মানুষ নদী-উপত্যকাকে বসবাসের উপযোগী বিবেচনা করেছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ পাথরের যুগে শিকারের জন্য মানুষের পক্ষে এক জায়গায় বসতি করা সম্ভব হয়নি। মানুষ যখন চাষবাস শিখল তখন থেকে এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজন দেখা দিল। নরম কাদামাটি নদীতীরে পাওয়ায় মানুষ ঐ কাদামাটি দিয়ে ঘর তৈরী শুরু করল। ঐ কাদামাটি দিয়ে তারা একদিন ইট তৈরী করল। সেই ইটকে আগুনে পুড়িয়ে বা রোদে শুকিয়ে নদী-উপত্যকায় মানুষ ঘর তৈরী করল। কেবল মিশরের মানুষ ঘর গড়তে পাথর ব্যবহার করে। এইভাবে নদী-উপত্যকায় নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে।

প্রায় প্রতিটি নগরে একজন করে দেবতা থাকতেন। এই নগর-দেবতার পূজো করতেন পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা। নগরের সব সম্পত্তি ঐ নগর-দেবতার অধীনে থাকত। ফলে পুরোহিতশ্রেণীর লোকেরা বিত্তবান হতেন। তাছাড়া নগরে থাকত বিভিন্ন কারিগর ও মজুরের দল। কারিগররা নিজেদের বৃত্তি অনুসারে কাজ করত। মজুরেরা তাদের সাহায্য করত। চাষ-আবাদে মজুরশ্রেণী পরিশ্রম করত। জমি-জমা হয় নগর-দেবতার আর তা না হয় বিত্তবানদের অধীনে থাকত। ক্রীতদাস প্রায় প্রতি দেশেই ছিল। বিশেষ করে মিশর ও সুমারে এদের সংখ্যা বেশী ছিল। তাদের দিয়ে সমাজের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নেওয়া হত। পুরোহিত, বিত্তবানরা বিলাসের মধ্যে থাকতেন আর গরীবরা অত্যাচার আর অবিচার সহ্য করে কোন রকমে দিন কাটাত। চীনে গরীবরা শামুক, গুগলি খেয়ে দিন কাটাত, হরপ্পার শস্যভাণ্ডারের ধারে খুপরী জাতীয়

আলোবাতাসহীন ঘরগুলি গরীবদের ছিল বলে অনুমান করা হয়। তাই বলা যায়, সে-সময় সমাজে ধনী-দরিদ্রের যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। দেশে রাজা ছিলেন। মনে করা হত তিনি হলেন ভগবানের প্রতিনিধি। তাই দেশের সমস্ত জমির প্রধান মালিক ছিলেন তিনি।

নদী-উপত্যকার সভ্যতার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মবিশ্বাস। প্রতিদেশেই দেব-দেবতার ছড়াছড়ি দেখা যায়। এই ধর্মবিশ্বাসের গোড়া পত্তন করে দেশের পুরোহিতশ্রেণী নামে এক চালাকচতুর বুদ্ধিজীবীর দল।

নদী-উপত্যকায় অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিল। তারা নৌকো গড়ে যেমন নদীপথে ব্যবসা শুরু করে তেমনি স্থলপথেও ব্যবসা করত গবাদি পশুর পিঠে মাল চাপিয়ে।

নগর-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নদী-উপত্যকার অধিবাসীরা নরম মাটির টালির ওপর কিছু লিখতে শুরু করে। এভাবে হয় প্রতিদেশেই লিপির উৎপত্তি।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

প্রাচীন সভ্যতাগুলো নগরকেন্দ্রিক। ধর্ম ছিল মানুষের কাছে অতিশয় ভীতির এবং প্রীতিরও। ফলে দেশশাসনে পুরোহিত ও মন্দিরের ছিল বিশেষ প্রভাব। প্রত্যেক সভ্যতাতেই স্বাধীন নাগরিকের সঙ্গে ছিল প্রচুর ক্রীতদাস। দেশের রাজাকে মনে করা হত ভগবানের প্রতিনিধি, যাঁর প্রধান কাজ দেশের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা।

অনুশীলনী

(ক) **রচনামূলক প্রশ্ন :—**

১। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর বন্যারোধের জন্য প্রাচীনকালে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

২। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুমেরিয়ানদের উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো কি কি ?

৩। মিশর সভ্যতাকে "নীলনদের দান" বলা হয় কেন ?

৪। পিরামিড কি? পিরামিড তৈরী হত কেন ? সবচেয়ে বিখ্যাত পিরামিড কোনটি ?

৫। ধর্ম সম্পর্কে মিশরীয়দের ধারণা কি ছিল ? তারা কোন কোন দেবদেবীর পূজা করতো ? তাদের ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও।

৬। সিন্ধু-সভ্যতার নগর পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। শীলমোহর কি ? এগুলো কোথায় পাওয়া গিয়েছে ? এগুলো কোন কাজে ব্যবহৃত হত ? এখনো এগুলোর কি গুরুত্ব আছে আমাদের কাছে ?

৮। কোন নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয় ? কোন রাজা এই দুঃখ দূর করেছিলেন এবং কিভাবে করেছিলেন ?

৯। পানকু কে ? পানকুর বিষয়ে কিংবদন্তী থেকে কি জানা যায় ?

১০। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি ? ঐ স্থানের এরকম নামকরণ হয়েছিল কেন ?

২। সুমেরিয়ানরা কি দিয়ে ঘরবাড়ী বানাতো ? ঘরবাড়ীগুলো কেমন ছিল ?

৩। বৎসরের হিসেব আবিষ্কার করে কারা ? কিভাবে এই হিসেব করা হত ?

৪। ফারাও কাকে বলা হত ? পিরামিড কথার অর্থ কি ?

৫। মিশরে কর আদায় করা হত কিভাবে ? কেমন করেই-বা এই কর দেওয়া হত ?

৬। হেয়ারোগ্লোফিক কি ?

৭। মহেন্-জো-দড়ো শব্দের অর্থ কি ?

৮। সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা যে লেখাপড়া জানতো তার প্রমাণ কি ?

৯। সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীরা কি কি খাদ্য পছন্দ করতো ?

১০। প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে চীন সভ্যতা বিচ্ছিন্ন ছিল কেন ?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

ক) — ও — নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল সুমের সভ্যতা।

খ) ফারাও শব্দের অর্থ — বাও করেন।

গ) মিশরে ক্রীতদাসদের বলা হত —।

ঘ) মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পর — আছে।

ঙ) 'পেপার' শব্দটি এসেছে — থেকে।

চ) সুমেরীয়গণ মন্দিরকে বলতো —।

ছ) হরপ্পা আবিষ্কার করেন —।

জ) সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা — ধাতুর ব্যবহার জানত না।

ঝ) চীনের রাজা — বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন!

ঞ) পানকুর — থেকে বস্ত্র এবং — থেকে জীবের সৃষ্টি হয়েছে।

ট) — সভ্যতায় পুরোহিতশ্রেণীর বিশেষ ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়।

ঠ) চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল — নদীর তীরে।

ড) প্রাচীন সভ্যতায় রাজাকে মনে করা হত — প্রতিনিধি।

ঢ) সিন্ধু-সভ্যতার —ভাষা আজও পাঠ করা যায় নি।

ণ) মহেন-জো-দড়ো বর্তমানে — অবস্থিত।

২। 'ক' স্তম্ভের বক্তব্যকে 'খ' স্তম্ভের বক্তব্যের সঙ্গে মেলাও :—

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ) মেসোপটেমিয়াকে বাইবেল বলা হয়েছে	অ) কিউনিফর্ম
আ) মন্দির ও প্রাসাদে ছাদ ও খিলান রীতির প্রচলন করে	আ) কেমি
ই) সুমারের লোকেরা লেখার যে লিপি আবিষ্কার করে তাকে বলে	ই) ধ্বংসের স্তূপ
ঈ) মিশরের লোকেরা লেখার যে লিপি আবিষ্কার করে তাকে বলে	ঈ) গার্ডেন অব ইডেন
উ) মিশরের লোকেরা নিজেদের বলতো	উ) কিউনিফর্ম
ঊ) মহেন-জো-দড়ো কথাটির অর্থ হল	ঊ) হেয়ারোগ্লোফিক

৩। নীচের প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গেই উত্তর বন্ধনীর ভেতর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করো।

অ) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে ওঠে?

(হোয়াংহো, নীলনদ, সিন্ধুনদ)

আ) সিন্ধু-সভ্যতার লোকদের প্রধান দেবতা কে ছিলেন ?

(পশুপতিনাথ, সূর্য, চন্দ্র ও সিরিস)

ই) সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা কোন ধাতুর ব্যবহার জানতো না ?

(তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ)

ঈ) কোন চৈনিক রাজা বন্যারোধের ব্যবস্থা করেন ?

(পানকু, উ, চৌ)

উ) ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই মৃত দেহকে রক্ষা করতো কারা ?

(সুমেরীয়গণ, মিশরীয়গণ, চীনাগণ)

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। মেসোপটেমিয়ার দুপাশ দিয়ে কোন কোন নদী প্রবাহিত ?

২। দেবী বাউ কাদের প্রিয় দেবতা ?

৩। মালপত্র ওজনের জন্য বাটখারা ব্যবহার করতো কারা ?

৪। কোন নদীকে মিশরের প্রাণ বলা হয় ?

৫। ফারাও কথাটির অর্থ কি ?

৬। মিশরীয়গণ কোন রাজাকে মহামতি বলতো ?

৭। কোন ফরাসী পণ্ডিত 'হেয়ারোগ্লোফিক ভাষার পাঠোদ্ধার করেন ?

৮। মহেন-জো-দড়ো সভ্যতা আবিষ্কার করেন কে ?

৯। সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা মৃতদেহকে কি করতো ?

১০। অন্যান্য সভ্যতা থেকে চৈনিক সভ্যতা বিচ্ছিন্ন ছিল কেন ?

(ঙ) কর্ম-শিক্ষার নির্দেশনা :—

১। একটি পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে তাতে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলো নির্দেশ কর।

২। পুডিং-এর সাহায্যে ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র তৈরী কর। তারপর কোন কোন অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতা বিস্তৃত হয় তা নির্দেশ কর।

৩। পাথরের টুকরো পরিষ্কার করে নিয়ে একটা পিরামিড তৈরী কর।

৪। পুডিং-এর সাহায্যে সিন্ধু-সভ্যতার কয়েকটি শীলমোহর তৈরী কর।

৫। মাটি দিয়ে মহেন-জো-দড়োর স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ তৈরী কর।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগ—(১) ব্যাবিলন (২) মিশরের সাম্রাজ্যশক্তির প্রসার (৩) ইরাণ (পারস্য) (৪) ইহুদী জাতির পরিচয় (৫) গ্রীক সভ্যতার পরিচয় (৬) রোম সাম্রাজ্যের বিস্তার (৭) চীন দেশের কথা

লৌহ যুগ ঃ | **পাঠবিন্যাস ঃ** (১) সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতি-ক্রিয়া (২) রাজপদের প্রবর্তন

বিষয়-সংকেত ঃ নদী যেমন কোন বাধা না মেনে কেবল এগিয়েই চলে, তেমনি মানুষ যখন একবার ভালমত বাঁচবার স্বাদ পেয়ে গিয়েছে, তখন তাকে আর থামায় কে? তার সেই ভালমত বাঁচার উপায় ছড়িয়ে যায় দিগ্বিদিকে। সেই ছড়িয়ে যাওয়ার খবরই এবার আমাদের আলোচ্য।

মানুষ পাথরের যুগ থেকে তামা-ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে তামা-ব্রোঞ্জ যুগে পৌঁছায়। তামা-ব্রোঞ্জ সহজে পাওয়া যেত না তাই মানুষ খুঁজতে লাগল সহজলভ্য অন্য কোন শক্ত ধাতু। মানুষ এই প্রয়োজন-বোধেই একদিন আবিষ্কার করল লোহা।

কারা কবে কিভাবে লোহা আবিষ্কার করেছিল তা আজও জানা যায়নি। জানা যায়নি কোথা থেকে তারা তা সংগ্রহ করল প্রথম। তবে অনুমান করা হয় পাথরের গায়ে লেগে থাকা লোহাই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করে। এ থেকে বলা যায়, পার্বত্য উপজাতীয় লোকরাই প্রথম লোহা আবিষ্কার করে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এশিয়া-মাইনরের মিতালি ও হিটাইট উপজাতীয় লোকরাই পর্বত-গাত্র থেকে লোহা আবিষ্কার করে। এই লোহা দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রতিক্রিয়া ঃ সে যাই হোক লোহা আবিষ্কার যে সমাজ জীবনকে ও রাজনৈতিক ধারাকে একেবারে পালটে দিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ লোহা ছিল সহজলভ্য, অল্পবিস্তর সব দেশেই পাওয়া যেত। ফলে তামা-ব্রোঞ্জ যুগে ঐ ধাতু

বিত্তবানদের হাতে ছিল, কিন্তু লোহা অতি শীঘ্র সর্বসাধারণের হাতে এল। লোহা তামা-ব্রোঞ্জ অপেক্ষা অনেক মজবুত ও টেকসই ধাতু। ঐ ধাতু দিয়ে তৈরী হতে লাগল চাষের যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র। ফলে চাষের কাজে বিস্তৃতি ঘটল। চাষীদের অবস্থার উন্নতি হল। ঘরসংসারের কাজের তৈজসপত্র ও ব্যবসায়ের যন্ত্রপাতি তৈরী হতে লাগল। ফলে সাধারণ লোকের অনেকের হাতে পয়সা এল। এতদিন বিত্তবানদের দাপট ছিল। বিত্তবানরা ক্রমে সাধারণকে সমীহ করতে শুরু করল। আর লোহা আবিষ্কারের ফলে সব চেয়ে বড় সুবিধে হল যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের। লোহার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলে গেল। দেশে দেশে তখন লোহা-ব্যবহারকারী জাতি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল।

লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যে রাজা সর্বপ্রথম তাঁর সৈন্য-বাহিনীকে সাজিয়ে ছিলেন তাঁর নাম দ্বিতীয় সারগণ। তিনি ছিলেন অ্যাসিরিয়দের রাজা। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল নির্মম ও নিষ্ঠুর। তাদের অত্যাচার কাহিনী সে সময় ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। এই দ্বিতীয় সারগণ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে ছয় শো বছর আগে রাজত্ব করতেন।

প্রাচীনকালে যেদিন থেকে মানুষ লোহার ব্যবহার করেছিল সেদিন থেকে লৌহযুগ শুরু হয়েছে। আজও সেই লৌহযুগ চলছে। লোহার যে কি প্রয়োজন মানুষ তা আজ পদে পদে বুঝছে।

একথা সত্য যে, লোহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার গতি অতি দ্রুত হয়েছে।

রাজপদের প্রবর্তন: লোহা আবিষ্কারে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলে গেল। লোহা-ব্যবহারকারী জাতিরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে অন্য জাতিদের ওপর চালাল আক্রমণ। এতদিন মানুষ সুস্থ জীবন-যাপন করছিল। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করে এক রকম সুখেই ছিল বলা যায়। দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজ বড় হতে লাগল। রাষ্ট্র বড়

হতে লাগল। তাদের নানা সমস্যা দেখা দিল এবং এই সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য মানুষ তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনকে বেছে নিল। সেই শ্রেষ্ঠজনকেই তারা রাজার আসনে বসাল। তাঁর কর্তব্য হল দেশগঠন ও দেশরক্ষা। তিনি তাঁর প্রজাদের সুখ-সুবিধের বন্দোবস্ত ও বিদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে লাগলেন। দেশের মানুষ সুখে থাকার জন্য তাঁর কথা মেনে চলতে লাগল। এইভাবে রাজপদের সৃষ্টি হল। প্রথম প্রথম এই রাজপদ বংশগত ছিল না। একজন রাজার মৃত্যু হলে দেশের মানুষ অপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজপদে বসাত। কিন্তু ক্রমে তাতেও অসুবিধে দেখা দিল। রাজপদ নিয়ে দেশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দেখে মানুষ রাজার ছেলে বা বংশধরকেই পরবর্তী রাজা বলে মেনে নিল। এভাবে রাজপদ একদিন বংশগত হয়ে দাঁড়াল।

● লোহ যুগ সম্পর্কে মনে রাখার কথা ●

লোহার ব্যবহার মানুষের জীবনধারায় নিয়ে আসে বিরাট পরিবর্তন। দ্রুতগতিতে মানুষের বাসস্থান হিসেবে নগর গড়ে উঠতে লাগলো। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিস্তৃত হল। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হল। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ক্রমশঃ মারাত্মক হয়ে উঠলো। ফলে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠা সহজ হয়ে গেল।

এক ঃ ব্যাবিলন	**পাঠবিন্যাস ঃ** (১) কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য (২) মন্দির ঃ পুরোহিত ও জ্ঞানচর্চা (৩) হামুরাবির অনুশাসন

মেসোপটেমিয়ায় সুমার সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সুমারের সভ্যতাকে ভিত্তি করে সুমারের উত্তর দিকে ব্যাবিলন সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে আরবের মরু অঞ্চল থেকে একদল মানুষ মেসোপটেমিয়ায় আসে। তাদের আমোরাইট বলা হত। এই আমোরাইট ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করতে থাকে। পরে এই ক্ষুদ্র গ্রাম

হয়ে ওঠে এক বিখ্যাত শহর এবং একটি সাম্রাজ্যের রাজধানী। ব্যাবিলনে বাস করত বলে তাদের বলা হত ব্যাবিলনিয়ান। এই শহরটিকে তারা গড়ে তোলে খুব বড় করে। জায়গাটির অবস্থান এমন চমৎকার স্থানে ছিল যে ক্রমশঃ এই ছোট্ট গ্রামটি বিরাট এক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাবিলনের সভ্যতার কথা জানা গিয়েছে বর্তমান যুগে। বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের বাগদাদ শহরের কিছু দক্ষিণে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষ বের করা হয়েছে।

কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যাবিলনের চারদিকে ছিল কৃষির উপযোগী উর্বর জমি। টাইগ্রিস নদীও ছিল কাছেই। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী-পথেই ব্যবসায়ীরা তাদের বড় বড় নৌকো ভর্তি করে মাল নিয়ে আসত বিদেশ থেকে। সেসব জিনিসের খুব চাহিদা ছিল দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায়। ব্যবসায়ীরা ফিরে যাবার পথে নিয়ে যেত ব্যাবিলন থেকে বিভিন্ন ফল, শস্য আর নানা শিল্প ও কারিগরি দ্রব্য। এদেশে তখন প্রচুর শস্য ও ফল উৎপন্ন হত। এমনিতে মেসোপটেমিয়া ছিল প্রাচুর্যের দেশ। ব্যাবিলনবাসীরা তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। এখানে এক ধরনের রঙীন কাপড় তৈরী হত। তার কদর ছিল তখন সভ্যজগতে প্রচুর। ব্যাবিলন শহরটির অবস্থান ছিল এশিয়া-মাইনর, ইউরোপ ও আফ্রিকা যাবার পথের ধারে। তাই অতি শীঘ্র ব্যাবিলন হয়ে ওঠে এক শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র।

মন্দির ঃ পুরোহিত ও জ্ঞানচর্চা ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের নাম স্মরণীয়। ব্যাবিলনিয়ানরা সুমার অধিকার করে। কিন্তু সুমারের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করেনি। তারা নিজেরাই সুমারের ভাষা ও লিপি গ্রহণ করে এবং তাকে আরও উন্নত করে তোলে।

ব্যাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে-দেশের পুরোহিত-শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ব্যাবিলনের মানুষেরা নানা দেবদেবীর উপাসনা করত। তাদের প্রতিটি শহরের আলাদা আলাদা দেবদেবী

ছিলেন। যেমন সূর্য দেবতা ছিলেন শামাশ, চন্দ্রের দেবতা ছিলেন নান্নার এবং প্রেমের দেবীর নাম ছিল ইশতার। আর ব্যাবিলনের সর্বপ্রধান দেবতা ছিলেন মারডাক। এই মারডাক ছিলেন সকল দেবতার দেবতা। এদেশে বহু দেবদেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মারডাকের মন্দিরটি ছিল ইটের তৈরী ছোট-খাটো একটা পাহাড়ের মত। তার উচ্চতা ছিল প্রায় নববুই মিটার। এরূপ মন্দির প্রায় সব নগর-দেবতারই ছিল।

এই নগর-দেবতাদের পুজো-অর্চনার ভার থাকত পুরোহিত শ্রেণীর ওপর। পুরোহিতরা দেবমন্দিরেই থাকতেন। মন্দিরকে দেশবাসীরা বলতেন 'জিগুরাত'। এই জিগুরাতে থাকত নগরের যাবতীয় সম্পদ। মন্দির সংলগ্ন থাকত পাঠশালা। এই পাঠশালায় পুরোহিতরা কৃষকের বাড়ী থেকে কিংবা বাজার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বড় একটা পয়সা দিতেন না। এজন্য কেউ কিছু বলত না। কারণ তাদের কাছে পুরোহিতরা ছিলেন ভগবান ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। তখনকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব ঘটনা ঘটত তা কেন ঘটছে তার কারণ তারা জানত না, তাই তারা সে-সব ঘটনাকে দেবতার লীলাখেলা বলে বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাস থেকেই জন্মেছে ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস। আর তাদের এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ পুরোহিতশ্রেণীর ক্ষমতা বাড়তে থাকে। তবে ব্যাবিলনের পুরোহিতরা নিষ্ঠুর ছিলেন না। তাঁরা অভাবের সময় দুঃস্থদের খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করতেন। নিজেরা অবশ্য বিলাস-বহুল জীবন-যাপন করতেন।

ব্যাবিলনে অনেক জ্ঞানীগুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ি ব্যাবিলনের জ্ঞানী পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেন। সেদেশে ভাল জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষী ছিলেন। গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে তাঁরা খোঁজ রাখতেন। মানুষের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব তাঁরা স্বীকার করতেন। সেদেশে কাদা-মাটির টালির ওপর লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে। ছবির মত অক্ষর সে-যুগে ব্যাবিলনিয়ানরা লিখত।

হামুরাবি নামে ব্যাবিলনের এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ব্যাবিলনের যথেষ্ট উন্নতি করেন। তাঁর আমলে ব্যাবিলনে লেখা-পড়ার যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল।

হামুরাবির অনুশাসন : হামুরাবি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিরাট এক সৈন্যদল গঠন করেন। সেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি সমগ্র মেসোপটেমিয়া জুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন।

এই হামুরাবির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল দেশ শাসনের জন্য আইন রচনা করা। এক বিরাট কালো পাথরে খোদাই করা তাঁর আইনের



হামুরাবি ও সূর্যদেবতা

কথাগুলো ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তা পড়ে তাঁর আইনগুলোর কথা এখনকার মানুষ জেনেছেন। ঐ পাথরখানা আজও লণ্ডনের যাদুঘরে রাখা আছে।

হামুরাবির সময় প্রত্যেক শহরে পৃথক পৃথক আইন ছিল। তিনি সে-সব আইন সংগ্রহ করে সারা রাজ্যের জন্য এক রকমের আইন

প্রণয়ন করেন। একেই বলে হামুরাবির অনুশাসন। আর এই কারণে বলা হয় তিনিই পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা। সে-যুগের অনেক কথা এই আইনের ধারা পড়ে জানা যায়। ঐ আইনে এরূপ কথা বলা আছে—

(১) আইন কেউ নিজ হাতে নিতে পারবে না। সরকার অপরাধীদের শাস্তি দেবে।

(২) ধনী-দরিদ্র সকলের ওপর এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য।

(৩) আইনের চোখে গরীব-বড়লোক সমান; তবু অভিজাতরা আইন ভাঙলে বেশী সাজা পাবে। কারণ তারা শিক্ষিত, তারা আইনকে ভালভাবে মেনে চলবে আশা করা যায়।

(৪) যে যা বৃত্তি নিয়ে আছে তার কোন রকম পরিবর্তন করা চলবে না। একজন করণিক ইচ্ছা করলে চাষী হতে পারবে না।

(৫) যে যেমন অপরাধ করবে সে তেমন সাজা পাবে। কেউ কারও চোখ কানা করে দিলে তারও চোখ কানা করে দেওয়া হবে।

(৬) আইনে নারী-পুরুষ সকলের সমান অধিকার থাকবে।

(৭) যদি কেউ ক্রীতদাসদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

(৮) যদি কেউ ঋণ শোধ করতে না পারে তাহলে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে তিন বছর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। যদি কেউ পুরোহিত বা সম্মানীয় কাউকে আঘাত করে তবে তাকে বলদমারার চাবুক দিয়ে ৬০ বার আঘাত করা হবে।

(৯) দেশের প্রতি পরিবারকে বাঁধ বাঁধা, খাল কাটা ইত্যাদি কাজ করতে হবে।

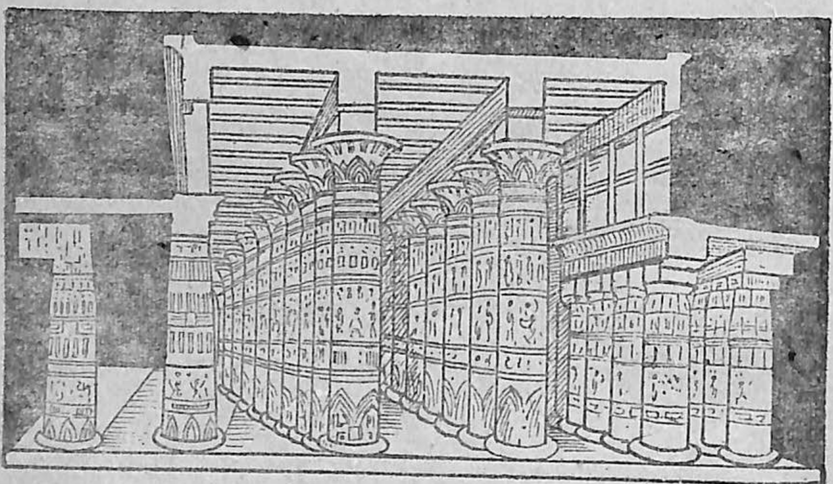
আইনের এই সব ধারা পড়লে কোন-কোনটা কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু তখনকার কথা বিবেচনা করলে এ আইন কঠোর বলে মনে হয় না। তবে তাঁর রচিত আইনের সব ধারা পড়ে এ-কথাই মনে হয় যে, ঐ আইনে দেশের গরীব অপেক্ষা অভিজাতরাই বেশী লাভবান হয়েছিল।

দুই : মিশরের সাম্রাজ্য শক্তির প্রসার

পাঠবিন্যাস : (১) উপনিবেশ
(২) পুরোহিতের ক্ষমতা

একদা মেনেস নামে এক রাজা সারা মিশর নিয়ে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মেনেসের সময় থেকে মিশরের রাজাকে বলা হয় ফারাও।

বিভিন্ন বংশের ফারাওরা প্রায় তিন হাজার বছর মিশরে রাজত্ব করেন। প্রথমে ফারাওরা মিশর দেশের দক্ষিণে অবস্থিত নুবিয়া দেশ জয় করেন। তারপর নুবিয়ার আরও পূর্বদিকে সিনাই অঞ্চল দখল করেন। সিনাই-এ তামার খনি থাকায় ফারাওদের অবস্থা ভাল হয়। সে-সময় হিকসস নামে এক পাহাড়ী জাতি এসে কিছুদিন মিশর অধিকার করেছিল। এই হিকসসরা ছিল খুব অত্যাচারী।



করনাক মন্দির

তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মিশরীয়রা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মিশরের দুই রাজকুমার —আহমোস আর আমোস। তাঁরা হিকসসদের প্রাধান্য দমন করেন। হিকসসদের কাছ থেকে মিশরীয়রা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে শেখে।

হিকসসদের তাড়িয়ে আহমোস ফারাও হয়ে রাজত্ব শুরু করেন। থেবস নগরী ছিল তাঁর রাজধানী। এই বংশের ফারাও প্রথম থুথমিস হিকসসদের সকলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর ধার পর্যন্ত অধিকার করেন। এই বংশের এক মহিলা ফারাও হয়েছিলেন। তাঁর নাম হাতসেসপুত। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম নারী যিনি রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত মহিলা ছিলেন। মিশরের বিখ্যাত করনাক মন্দিরটি তিনিই নির্মাণ করান। তারপর ফারাও হন তৃতীয় থুথমিস। তাঁকে বলা হয় 'মিশরের নেপোলিয়ান'। তিনি খুব পরাক্রান্ত ফারাও ছিলেন। তাঁর আমলে মিশরের রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত হয়। এশিয়া-মাইনরের বহু অংশ তিনি জয় করেন। তাঁর সময়ে মিশরের নৌবাহিনীও ভূমধ্যসাগরে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি যে দুটি বিখ্যাত জায়গায় জয়লাভ করেন তা হল প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার জনগণ মিশরীয়দের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু থুথমিসের আদেশে তাঁর সৈন্যবাহিনী ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে এদুটি দেশকে মরুভূমি করে দেয়। তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দেশে ক্রীত-দাস করে রাখে।

বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করে মিশরের ফারাওরা এতবেশী লোকজন, ঘোড়া, ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে যেতেন যে গুজব রটে গিয়েছিল, মরুভূমিতে যে পরিমাণ বালি থাকে সেই পরিমাণ ধনরত্ন নাকি আছে প্রত্যেক ফারাও-এর।

তৃতীয় থুথমিসের একশো বছর পর যিনি ফারাও হন তিনি ছিলেন ধর্মোন্মত্ত। এই ফারাও-এর নাম আমেনহোটেপ। তাঁর খামখেয়ালি-পনার জন্য সাম্রাজ্যের অনেক অংশ স্বাধীন হয়। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'শো বছর পরে মিশরের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস। তাঁর ভাল কাজের জন্য জনসাধারণ তাঁকে 'মহামতি রামেসিস' বলত। তিনি হিটাইটদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সন্ধি করতে বাধ্য করেন। এ সন্ধির ফলে মিশর পরবর্তী ছ'শো বছর শান্তিতে থাকে।

উপনিবেশ ঃ মিশরের ফারাওরা যে বিরাট সামাজ্য বিস্তার করেছিলেন তার প্রতিটি অংশ নিজেরা শাসন করতে পারতেন না। নতুন নতুন দেশ জয় করে তাঁরা রাজকুমার বা আত্মীয়দের ঐসব দেশের সর্বোচ্চ শাসনকার্যে বসিয়ে দিতেন। তাঁরা বিজিত দেশে গিয়ে স্থানীয় লোকদের থেকে আলাদা হয়ে বসবাস করতেন। এইভাবে ফারাওরা মিশরের উপনিবেশগুলো শাসন করতেন। এই উপনিবেশ থেকে প্রচুর সম্পদ আসত মিশরে। ফলে মিশর ও মিশরের ফারাওরা বিত্তবান হতেন আর উপনিবেশের লোকজন হত শোষিত।

পুরোহিতের ক্ষমতা ঃ মিশরের লোকেরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তাদের দেশে বহু মন্দির ছিল। প্রত্যেক মন্দিরে থাকত এক একটি দেবতা। মন্দিরের দেবতাকে পূজো করতেন পুরোহিতরা। এই পুরোহিতদের মিশরবাসীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

পুরোহিতরা ছিলেন খুব ধনী। কারণ জনসাধারণ মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে যা কিছু দিত তা সবই ছিল পুরোহিতদের সম্পত্তি। আবার ফারাওরা দেশ জয় করে যে-সব ধনসম্পদ আনতেন তার ভাগও পুরোহিতরা পেতেন।

পুরোহিতরা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তাঁরা মাথার চুল কামিয়ে নেড়া হতেন। মাছ-মাংস এমনকি বীন্ জাতীয় শাকসব্জীও তাঁরা খেতেন না। জনজীবনে এই পুরোহিতশ্রেণীর প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। পুরোহিতরা মিশরীয়দের বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, তাঁদের কথামত না চললে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব হবে না। মৃত্যুর পর জীবনের নানা কথা বলে তাঁরা জনসাধারণ এমনকি ফারাওদের বশে রাখতেন। এভাবে গোটা মিশরের জনসাধারণকে তাঁরা হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন। জনসাধারণের জীবনযাত্রাও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ মন্দিরে দিতে বাধ্য থাকত। এভাবে পুরোহিতরা প্রচুর

সম্পত্তির মালিক হতেন। থেবস নগরে এমন একজন পুরোহিতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাঁর ছিল আশী হাজার কর্মচারী আর চার লক্ষ গবাদিপশু। পুরোহিতরা ফারাওদের জীবনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে এক সময় একজন পুরোহিতও ফারাও হয়েছিলেন।

তিন : ইরাণ (পারস্য)

পাঠবিন্যাস : (১) পারস্যের জাগরণ (২) জরথুস্ত্র

ভারত থেকে কিছু পশ্চিমে পারস্যদেশ অবস্থিত। দেশটি ইরাণ নামেও পরিচিত। মাত্র ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সরকারী আদেশে এদেশের নাম হয় ইরাণ। প্রাচীনকালে আর্যদের একটি দল ইরাণে এসে বাস করতে থাকে।

তারা ছোট ছোট গ্রামে বাস করত, চাষ-আবাদ আর ভেড়া-ছাগল চরিয়ে দিন কাটাত। তারা সকলে এক জাতির লোক ছিল না, নানা উপজাতিতে তারা বিভক্ত ছিল।

পারস্যের জাগরণ : শোনা যায় কাইরাস নামে একজন বহু দেশজয়ী পারসিক যোদ্ধা এখানে সকল উপজাতিদের নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশের লোকদের একত্র করে, তাদের এক জাতিতে পরিণত করেন।

পারসিকদের একটা বিশেষ গুণ ছিল। তা হল একটা দেশ জয় করলে পারসিকরা সে দেশের সব ভাল জিনিস শিখে নিত। ব্যাবিলন জয় করে তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করতে শিখল, মিশর জয় করে মন্দিরে কারুকার্য করা শিখে নিল। তারপর তারা নিজের দেশে বড় বড় শহর গড়ে তুলল। সেকারণে শীঘ্রই তারা এক বিরাট সভ্যজাতি হয়েছিল।

পারস্যে আজ পর্যন্ত যত রাজা রাজত্ব করেছেন, তাঁদের মধ্যে দরায়ুস ছিলেন সবচেয়ে বড়। সম্রাট দরায়ুসের সাম্রাজ্য সিন্ধুনদের তীর থেকে মিশর দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইরাণের পার্সেপোলিস

শহরে ছিল দরায়ুসের প্রাসাদ। তাঁর সৈন্যদলে ছিল মিশরের লোক, মধ্য-আফ্রিকার সিংহ-চর্ম পরা নিগ্রো, উত্তর আফ্রিকার উট-সওয়ার নিগ্রো, হাতি-সওয়ার হিন্দু সৈন্য। তিনি এরূপ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে রাজ্য জয় করতে করতে গ্রীসে পেলেন বিরাট আঘাত। গ্রীস আক্রমণ করে দরায়ুস কিছুতেই জয়লাভ করতে পারলেন না। ম্যারাথনের যুদ্ধে তিনি গ্রীসের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এথেন্সের কাছে হেরে গেলেন। এ সংবাদে তিনি মনে নিদারুণ দুঃখ পেলেন এবং কিছুদিন পরেই মারা গেলেন।

দরায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জেরাকসস সিংহাসনে বসেন। তিনি পুনরায় গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ থার্মো-পলির গিরিপথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে পারসিকরা জয়লাভ করল। স্পার্টারাও এযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এযুদ্ধে স্পার্টার বিখ্যাত বীর লিওনিডাস ও তাঁর তিনশো সহযোদ্ধার অসীম বীরত্বের কথা ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। গ্রীকরা আরটেমিসের জলযুদ্ধেও পারস্যের কাছে হেরে গেল। কিন্তু জলপথে সালামিসে পারসিকরা গ্রীকদের কাছে পরাজিত হলেন। গ্রীস জয়ের আশা সম্পূর্ণ অতৃপ্ত রয়ে গেল পারসিকদের।

জেরাকসসের পর দ্বিতীয় দরায়ুস ছাড়া পারস্যে আর তেমন কোন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন না। তাই পারস্যের অবনতি শুরু হয়। অবশেষে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করেন। এ ঘটনা ঘটে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিনশো তিরিশ বছর আগে।

জরথুস্ত্র ঃ ভারতের বৈদিকযুগের মত ইরাণেও প্রাকৃতিক নানা দেবদেবীর পূজো প্রচলিত ছিল। এমন সময় এই পারস্য দেশে জরথুস্ত্র নামে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর ধর্মমত ও স্তোত্র নিয়ে 'জেন্দ-আবেস্তা' নামে এক গ্রন্থ রচিত হয়। এটি পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ। জরথুস্ত্রের মতে পৃথিবীতে দুটি শক্তি সব সময় কাজ করে। এদের একটি হল সৎ শক্তি এবং অপরটি হল অসৎ শক্তি। এই দুই শক্তির

দ্বন্দ্ব সব সময়ে চলে। তাঁর মতে সত্য, আলো ও স্বর্গের দেবতা হলেন 'আহুর মাজদা'। আর অসৎ শক্তির রাজা হলেন আহরিমান। ইনি হলেন অন্ধকার, কপটতা, অসত্য ও মিথ্যার দেবতা। তিনি 'আহুর মাজদা'র পূজোর প্রচলন করেন। ইরাণীরা কোন দেবমূর্তি গড়ে পূজো করত না। তারা মন্দিরের ভিতর বেদী বানিয়ে তার ওপর আগুন জ্বালিয়ে উপাসনা করত। আগুনকে তারা অতি পবিত্র মনে করত। প্রকৃত ইরাণীরা আজও এ প্রথা মেনে আসছে।

ইরাণীরা মৃতদেহকে না পুড়িয়ে বা কবরে না দিয়ে এক উঁচু খোলা জায়গায় রেখে দেয়। তাদের বিশ্বাস পশু-পাখীদের খাবার হল এই মৃতদেহ।

তাদের বংশধররা ভারতে পার্সি নামে পরিচিত। আজও তারা জরথুস্ত্রের প্রবর্তিত ধর্ম মেনে চলে।

চার : ইহুদী জাতির পরিচয়

পাঠবিন্যাস : (১) মিশরে ইহুদী জাতি (২) মোজেসের অধীনে ইহুদীর দাসত্ব থেকে মুক্তি

পশ্চিম এশিয়ায়, আরব দেশের উত্তর-পশ্চিম ও সিরিয়ার দক্ষিণে আছে একটি ছোট্ট দেশ। সেই দেশের নাম প্যালেস্টাইন। দেশটি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই দেশের খুব কাছে মিশর দেশ।

প্যালেস্টাইনের সভ্যতাও খুব পুরানো। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, তারা প্রথমে দক্ষিণ পালেস্টাইনের জুডিয়া রাজ্যে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তাদের রাজধানী ছিল জেরুজালেম শহরে।

মিশরে ইহুদী জাতি : ইহুদীদের প্রাচীনকালের কথা খুব স্পষ্ট করে জানা যায় না। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' থেকে জানতে পারি যে, ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাস আশে-পাশের বড় বড় রাজ্যগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে আছে। এর একটা কারণও ছিল। প্যালেস্টাইন দেশটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে, এই দেশের মধ্যে মিশর

এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করত। তাই ইহুদীদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াই ছিল খুবই স্বাভাবিক।

'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' থেকে আমরা আব্রাহামের কথা এবং তাঁর সময় থেকে ইহুদীদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাই। খুব সম্ভব, আব্রাহাম ছিলেন ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হামুরাবির সময়ের লোক। তিনি ছিলেন সেমেটিক জাতির অন্তর্গত, এবং যাযাবর গোষ্ঠীর দলপতি। তাঁর নিজের ভ্রমণকাহিনী, তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির নানা গল্প এবং কি করে তাঁরা মিশরে বন্দী হলেন এই সব কথা ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এ বর্ণনা করা আছে।

ইহুদীরা মিশরে কেন গিয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে তাদের ধর্মগ্রন্থে বলা আছে যে, একবার দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। তখন খাদ্যের সন্ধানে তারা মিশরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু মিশরে যাবার পর তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। তাদের ওপর করা হত অকথ্য অত্যাচার। মিশরের এক বিবরণ থেকে জানা যায়, তারা ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে মিশরে গিয়েছিল খাদ্যের সন্ধানে।

মোজেসের অধীনে ইহুদী : দাসত্ব থেকে মুক্তি : যাই হোক ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে জানা যায়, মোজেস নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ইহুদী জাতি মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। মোজেসের জন্ম কাহিনীও চমৎকার। শোনা যায় তিনি নাকি ঈশ্বরের নির্দেশে ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কাজে এগিয়ে আসেন। তিনি সমস্ত ইহুদীকে একত্রিত করে আবার নিজের দেশে নিয়ে চলেন। যাবার পথে পড়ে লোহিতসাগর। লোহিতসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে কাতর আহ্বান জানান তাঁর দেশের মানুষকে যাবার রাস্তা তৈরী করে দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে লোহিতসাগর দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। সমস্ত ইহুদী নিশ্চিন্ত মনে লোহিতসাগর পার হয়ে যায়। এদিকে ইহুদীদের অনুসরণ করে ছুটে আসছিল মিশরের ফারাও-এর সৈন্যবাহিনী। তারাও যখন ইহুদীদের অনুসরণ করে লোহিত-সাগর পার হতে যায়, বিভক্ত সাগর তখন জোড়া লেগে সমস্ত মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে ইহুদীরা মোজেস-এর নেতৃত্ব মিশরে দাসত্ব করা থেকে রেহাই পায়।

মোজেসকে ইহুদীরা তাদের প্রধান ধর্মগুরু বলে মেনে চলত। মোজেস ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া দশটি আদেশ প্রচার করে ইহুদীদের একটা নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসেন এবং গোটা



মোজেস

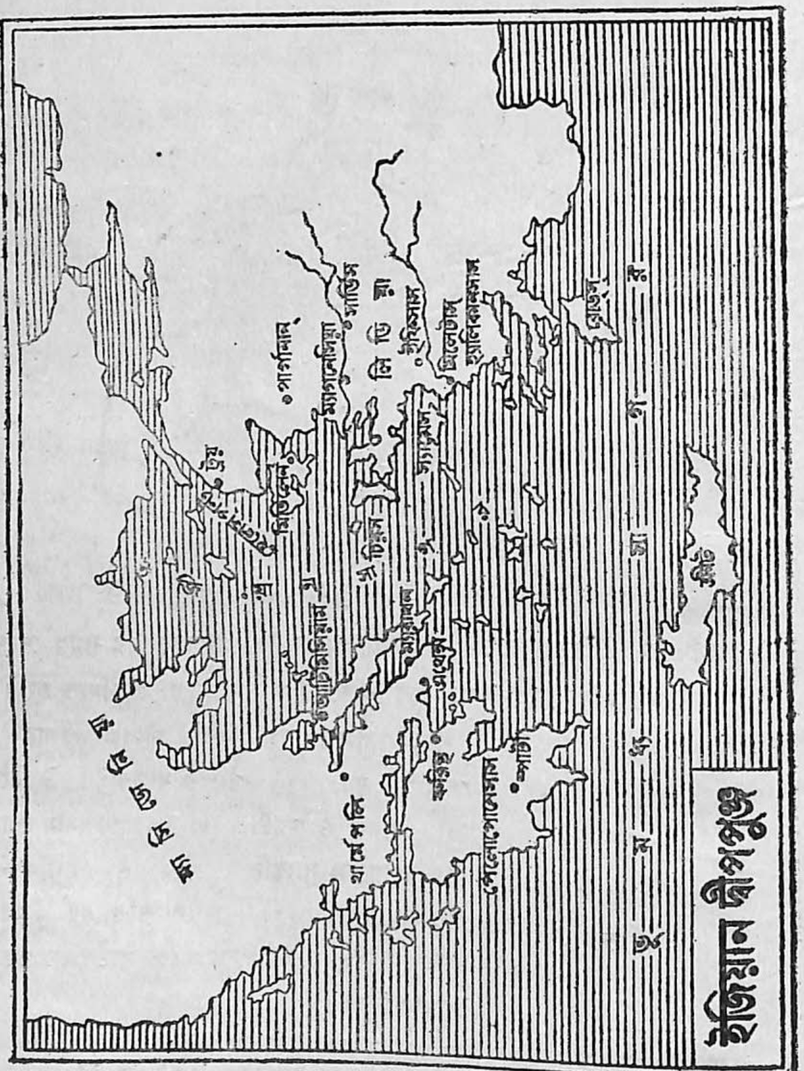
জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেন। মোজেস-এর সময় থেকেই ইহুদীদের মধ্যে ধর্মগুরু বা পুরোহিতদের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

পাঁচ : গ্রীক সভ্যতার পরিচয়

পাঠবিন্যাস : (১) ক্রীট দ্বীপের প্রভাব ও হোমারের যুগ, (২) গ্রীসের নগররাষ্ট্র : উপনিবেশ (৩) এথেন্স ও স্পার্টা, (৪) এথেন্স বনাম স্পার্টা, (৫) এথেন্সের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব, (৬) ম্যাসিডন ও আলেকজাণ্ডার, (৭) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, (৮) আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পতন : রোমান বিজয়।

গ্রীস ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর পূর্বদিকে ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আইওনিয়ান সাগর। সমগ্র গ্রীস দেশ পাহাড়ী এলাকা। কৃষির উপযোগী জমির

খুবই অভাব। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রধান হল আকরিক লোহা, তামা ও রূপা। তাছাড়া মার্বেল পাথর ও এক রকমের নরম পাথর এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।



প্রাকৃতিক গঠনের দিক থেকে গ্রীসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপনিসাস মূল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। উত্তর ও

মধ্য গ্রীস বিরাট এবং অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব এমন পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত। কেবলমাত্র উপকূলভাগের কাছে এক গিরিপথ আছে —তার নাম থার্মোপলি গিরিপথ। প্রাচীনকালে এই গিরিপথ দিয়েই যাতায়াত চলত।

এই তিনটি ভাগের প্রত্যেক ভাগ আবার পর্বতমালা দিয়ে কতকগুলো ছোট অঞ্চলে বিভক্ত। ফলে প্রাচীনকালে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করাটাই ছিল এক কঠিন কাজ।

ক্রীট দ্বীপের প্রভাব : গ্রীকদের উন্নতির অনেক আগেই ইজিয়ান সাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপকে কেন্দ্র করে এক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। এই সভ্যতাকে বলা হয় ইজিয়ান সভ্যতা। এই সভ্যতা ছিল মিশর ব্যাবিলন সভ্যতার সমসাময়িক। ক্রীট দ্বীপ এমন জায়গায় অবস্থিত ছিল যে সেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। দ্বীপের অধিবাসিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর ধন-সম্পদ উপার্জন করত। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট ছিল না। সুতরাং তারা শিল্পকলার চর্চায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করার সুযোগ পেত।

ক্রীটদের রাজাদের বলা হত মাইনস। তাঁরা গোলকধাঁধার মত এক প্রাসাদে বাস করতেন। ধ্বংসাবশেষে দেখা গিয়েছে এই প্রাসাদে আধুনিক জীবনযাত্রার সব সুবিধেই ছিল। এদের চিত্র শিল্প, ভাস্কর্য শিল্প, বস্ত্রবয়ন শিল্প, হাতির দাঁতের কাজ আজও আমাদের বিস্মিত করে। দীর্ঘ সময় ধরে তারা নিরুপদ্রবে থাকতে পেরেছিল বলেই তাদের পক্ষে এক বিস্ময়কর সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ গ্রীসে মাইসিনিয়ান সভ্যতা নামে আর এক সভ্যতার বিকাশ হয়। এরাই ক্রীট সভ্যতাকে ধ্বংস করে। তাহলেও গ্রীক সভ্যতা ইজিয়ান সভ্যতার কাছে অনেক দিক থেকেই ঋণী।

হোমারের যুগ : প্রাচীন গ্রীসের চারণ কবিগণ নানা বীরের কাহিনী গান গেয়ে গেয়ে প্রচার করে বেড়াতেন। এইসব কাহিনীকে

অবলম্বন করে গ্রীসের বিখ্যাত অন্ধ কবি হোমার দুটি অমর মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' রচনা করেন। এই দুই মহাকাব্য থেকে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এক নিখুঁত ছবি আমরা পাই।

ইলিয়াড মহাকাব্য—এশিয়া মাইনরে ট্রয় নামে এক শহর ছিল। গ্রীকগণ একবার এই ট্রয় নগর আক্রমণ করে। দীর্ঘ নয় বছর এই নগর ঘিরে রেখেও গ্রীকরা নগরটি জয় করতে পারে না। কারণ নগরটি ছিল একটি পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত এবং চারদিকে পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

গ্রীকদের সবচেয়ে ভাল যোদ্ধার নাম অ্যাকাইলাস। যুদ্ধের দশম বছর তাঁর সঙ্গে গ্রীক সেনাপতির যুদ্ধ হয়। ফলে সে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে এবং গ্রীকরাও পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত অ্যাকাইলাস তার ঝগড়া মিটিয়ে নিয়ে আবার যুদ্ধে যোগদান করেন এবং গ্রীকদের জয় হয়। হোমার তাঁর মহাকাব্যে গ্রীক সৈন্যবাহিনীর এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা থেকে সে সময়কার গ্রীসের সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন সাধারণ সৈনিকরা খালি পায়ে কেবল বর্শা ও পাথর নিয়ে যুদ্ধ করত। তাদের পোষাকও ছিল খুবই সাধারণ। যাঁরা বিভিন্ন গ্রীক গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন. তাঁরা তামার তৈরী বর্ম পরতেন, ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করতেন, বর্শা ছাড়া তাঁদের অস্ত্র ছিল ব্রোঞ্জের তৈরী তরবারি। তাছাড়া গ্রীকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠীর লোকজনকে নিয়ে আলাদা আলাদা যুদ্ধ করত। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ট্রয়ের বিখ্যাত বীর হেক্টর অ্যাকাইলাসের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁকে কবর দেওয়ার বর্ণনা দিয়ে ইলিয়াড মহাকাব্য শেষ হয়েছে।

ওডিসি—ওডিসি মহাকাব্যও গ্রীক ও ট্রয়বাসীর যুদ্ধের কাহিনীকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ওডিসি ছিলেন একজন গ্রীক দলপতি যিনি ট্রয় যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি কিভাবে ট্রয়

থেকে গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত নিজ দেশ ইথাকাতে ফিরে এসেছিলেন তারই কাহিনী মহাকবি হোমার তাঁর ওডিসি মহাকাব্যে লিখেছেন।

ইথাকার সৈন্যগণ বারোটি জাহাজে দেশে ফেরার জন্য যাত্রা আরম্ভ করল। তখনও ট্রয় শহর পুড়ছে। এর মধ্যে আরম্ভ হল তুমুল ঝড়। ফলে সমুদ্রপথে তারা পথ হারাল। পথ হারিয়ে তারা গিয়ে পৌঁছোল দৈত্যদের দেশে। এইসব দৈত্যরা পর্বতের মত উঁচু। তারা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে এগারটি জাহাজ ভেঙ্গে ফেলল এবং ঐ সব জাহাজের সব সৈন্যই মারা গেল। কেবল একটি জাহাজ রক্ষা পেল।

কিন্তু ওডিসির লোকেরা বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা জিউসকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। জিউস বজ্র নিক্ষেপ করে ঐ অবশিষ্ট একটিমাত্র জাহাজ ও ধ্বংস করে ফেললেন। কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেলেন একমাত্র ওডিসি।

তারপর দীর্ঘ দশ বছর নানা পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরলেন ওডিসি। তখন তার অবস্থা ভিখারীর মত। তিনি আশ্রয় পেলেন তাঁরই এক ক্রীতদাসের কাছে। এই ক্রীতদাস তাঁর শুয়োরের খামার দেখাশুনা করত। শেষ পর্যন্ত নানা যুদ্ধবিগ্রহ করে ওডিসি আবার তাঁর হারানো ক্ষমতা ফিরে পেলেন। এই হল ওডিসি মহাকাব্যের কাহিনী।

মহাকাব্য দুটি মূল্য ঃ হোমার তাঁর মহাকাব্য দুটিতে এমন সব কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, অনেকে মনে করেন সব গল্পই বানানো এসব কিছুর কোন সত্যতা নেই। কেউ বলেন, ট্রয় বলে নাকি কোন শহরই ছিল না।

কিন্তু হোমারের বর্ণনা মত যেখানে ট্রয় ছিল বলে বলা হয়েছে সেখানকার মাটি খুঁড়ে সত্যিই এক শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আরও মজার হল, এই শহরের গঠন হোমারের বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যায়। আরও বড় কথা হল, শহরটি আগুনে পুড়ে

ধ্বংস হয়েছে এমন প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে, ঠিক যেমনটি হোমার লিখেছেন। সুতরাং ট্রয় শহর যে ছিল এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাহলে হোমারের বর্ণনাকে শুধু কল্পনা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই বলা যায় হোমারের মহাকাব্য প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পরিচয় জানার এক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। এ কারণেই এই যুগের সভ্যতাকে হোমারের যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

হোমারের যুগের গ্রীসঃ হোমারের যুগে গ্রীকদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালন।

কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ। কেননা কৃষিকাজের জমি খুব একটা বেশী ছিল না। থাকলেও তা ছিল পাথুরে। তাছাড়া বৃষ্টিপাত ছিল এত অনিয়মিত যে, তাতে কৃষিকাজে বেশ অসুবিধে হত। পরবর্তীকালে লোহার লাঙ্গল প্রচলিত হবার পর কৃষিকাজ অনেক সহজ হয়েছে। কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য ছিল বার্লি ও আঙ্গুর।

পশুপালনের মধ্যে প্রধান ছিল ছাগল ও ভেড়া। শুয়োরও পালন করা হত। কৃষক ও পশুপালকরা নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু নিজেরাই তৈরী করত।

শিল্পীরা ধনীদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাত। অস্ত্রশস্ত্র, সোনা-রূপার গহনা ইত্যাদি যোগান দিত শিল্পীরাই।

সমুদ্রের খুব নিকটে থাকার জন্য গ্রীকরা নৌ-বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষ ছিল। তারা কাঠের বড় বড় জাহাজ তৈরী করতে পারত। কিন্তু এই সব জাহাজে বেশীদূর যাওয়া সম্ভব ছিল না।

অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত গ্রীসদেশের প্রতিটি দ্বীপেই আলাদা আলাদা গোষ্ঠী বাস করত। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে আবার নানা উপজাতি থাকত। বিভিন্ন উপজাতির জন্য পৃথক জমি থাকত। এই সব উপজাতিদের আবার একজন করে প্রধান ছিল। উপজাতিদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ছিল। ফলে ধনীরা গরীবদের চাষবাসের জন্য মজুর হিসেবে নিয়োগ করত। এভাবেই গ্রীসদেশে এসেছিল

ক্রীতদাস প্রথা। আবার ধনীদের মধ্যেও যারা ছিল বেশী ধনী তাদের বলা হত অভিজাত। এদের ছিল অসম্ভব ক্ষমতা।

নগর-রাষ্ট্র ঃ বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস—এমন অবস্থা থেকে তারা ক্রমশঃ নিজ নিজ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। এইভাবে সমগ্র গ্রীস বিভিন্ন নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন—এথেন্স, স্পার্টা, থিবস্, ম্যাসিডন ইত্যাদি। এইসব নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। আবার রাষ্ট্রগুলোর ভেতরও ক্ষমতার লড়াই চলত অভিজাতদের মধ্যে। যেমন এথেন্সে সাধারণ মানুষেরা অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ শাসনের ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

যাই হোক গ্রীসের যেসব বন্দর ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল সেসব জায়গায় নানা শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল। যেমন, মিলেসাসে ছিল পশমের কারখানা, কোরিন্থে ছিল অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা।

গ্রীস উপনিবেশ স্থাপন ঃ সমুদ্রের খুব কাছাকাছি থাকার ফলে গ্রীকরা প্রথম থেকেই জাহাজ নিয়ে বিভিন্নস্থানে যাতায়াত করত। জিনিসপত্র তারা কোন বিদেশী বন্দরে গিয়ে জাহাজ ভিড়াত। বেচাকেনা করে চলে আসত।

কিন্তু এই বেচাকেনাকে আরও বেশী লাভজনক করবার জন্য গ্রীসের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্র বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনে মন দিল। ভূমধ্য ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূল ঘিরে পড়ে উঠল নানা গ্রীক উপনিবেশ। শিল্পশ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা আরও বেশী লাভের আশায় উপনিবেশ নিয়ে আগ্রহ দেখাতে লাগল। আর গরীবেরা দেশে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে না পেরে বিদেশে পাড়ি জমাতে লাগল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজাতরা বিরোধীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল। এই বিতাড়িত যারা তারাও বিদেশে নিজেদের জীবনকে নতুন করে গড়তে উৎসাহী হল।

বিদেশে গিয়ে এই সব গ্রীকরা উপকূলের কাছাকাছি বসবাস করতে আরম্ভ করল। তারা তাদের বসতি নিরাপদ করতে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিল। কাছে-পিঠের উর্বরা জমি জোর করে দখল করে নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে আরম্ভ করল। এই সঙ্গে একটা চমৎকার ঘটনাও ঘটতে লাগল। তা হল, গ্রীসের বিভিন্ন এলাকার লোক বিদেশে একত্রিত হয়ে বসবাস করতে গিয়ে নিজ নিজ দেশের পার্থক্যের কথা ভুলে গেল। বিদেশে তারা তাদের পরিচয় দিত কেবল গ্রীকবাসী বলে। এইভাবে তাদের মধ্যে গ্রীসদেশ সম্পর্কে ভালবাসা জন্মাতে লাগল।

উপনিবেশ স্থাপনের গুরুত্ব ঃ গ্রীকদের এই উপনিবেশ স্থাপনের গুরুত্ব কিন্তু অনেক। উপনিবেশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক শিল্পের চাহিদা বাড়তে লাগল। আবার অধিক পরিমাণে শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্রীতদাস দেশে আনা আরম্ভ হল। কোন কোন নগর-রাষ্ট্রে স্থানীয় অধিবাসীদের তুলনায় ক্রীতদাসদের সংখ্যাই হয়ে গেল বেশী।

এথেন্স ও স্পার্টার কথা ঃ প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল উত্তর-পূর্ব গ্রীসে এথেন্স, দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্টা ও করিন্থ, উত্তরে থিবস্, তারও উত্তরে ম্যাসিডন।

মধ্য-গ্রীসের একটি জেলা এ্যাটিকা। এই জেলারই সমতল ভূমির মধ্যস্থলে একদা গড়ে উঠেছিল এক শহর, নাম এথেন্স। শহরটি ছিল পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গ্রীক ভাষায় এই প্রাচীরকে বলা হয় 'এ্যাথোপলিস্'। কোন শত্রু আক্রমণ করলে অধিবাসিগণ এই প্রাচীরের ভেতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করত। এইভাবেই তারা পারস্য সম্রাট দরায়ুসের গ্রীস আক্রমণকালে নিজেদের রক্ষা করেছিল।

নানা শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে এথেন্স ছিল এক চমৎকার জায়গা। কেননা এ্যাটিকা জেলায় মার্বেল পাথর আর

রূপার অভাব ছিল না। আবার এথেন্স ছিল সামুদ্রিক বন্দরের খুব কাছেই। আশেপাশের লোকেরা এথেন্সে জলপাইয়ের তেল ও মদ এবং পশমের বস্ত্র নিয়ে আসত। আর এথেন্স থেকে তারা নিয়ে যেত নানা রকমারি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

ধীরে ধীরে শহরের প্রাচীরের ধার ঘেঁষে গড়ে উঠতে লাগলো নানা শিল্প-কারখানা। কোথাও হাপর চালিয়ে কামার কাজ করছে। কোথাও স্বর্ণকার বানাচ্ছে নানান অলংকার। কোথাও তৈরী হচ্ছে রকমারি পোষাক-পরিচ্ছদ। কোথাও তৈরী হচ্ছে বাসন-পত্র, যার খ্যাতি সারা গ্রীসদেশ জুড়ে।



গ্রীসের বাসনপত্র

সমুদ্রের বন্দরে এসে ভিড়ত কত জাহাজ। জাহাজভর্তি আসত খাদ্যশস্য, লবণ, লোনা মাছ প্রভৃতি। আর নিয়ে যেত এথেন্সে তৈরী নানা শিল্পসামগ্রী।

গোটা এথেন্স শাসন করার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল অভিজাতদের হাতে। তারা বয়স্কদের নিয়ে গঠিত পরামর্শ সমিতির সাহায্যে শাসন করত। আবার কেবলমাত্র যারা অভিজাত তারাই পরামর্শ সমিতির সদস্য হতে পারত। বিচারকদের বিচার সব সময়েই অভিজাতদের পক্ষেই যেত। লঘু পাপে গুরুদণ্ডই ছিল তখনকার বিচারের ধারা। প্রত্যেক অভিজাতরাই ক্রীতদাসদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে একদল সশস্ত্র বাহিনী রাখত। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হত অভিজাত-তন্ত্র।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ যারা, যেমন—চাষী, ব্যবসায়ী, ক্রীতদাস, জাহাজের মালিক ইত্যাদি তারা এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় খুশী ছিল না। কেননা তারাও চাইতো এথেন্সের শাসনব্যবস্থায় অংশ নিতে। ফলে অভিজাত এবং সাধারণ মানুষ উভয় পক্ষের মধ্যে ছিল তুমুল বিরোধ। শেষ পর্যন্ত ৫৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন সোলোন নামে এক অভিজাত অথচ গরীব এথেন্সের শাসক নির্বাচিত হলেন তখন ঘটল এক বিরাট পরিবর্তন।

সোলোন কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করে দিলেন। যারা ঋণ শোধ করতে না পেরে ক্রীতদাস হয়েছিল তাদের তিনি মুক্তি দিলেন। ভবিষ্যতে নতুন করে ক্রীতদাস করা নিষিদ্ধ করা হল।

এই সব ব্যবস্থার ফলে শাসনব্যবস্থাতেও এল পরিবর্তন। অভিজাতরা যে জনপ্রতিনিধি সভা বন্ধ করে দিয়েছিল তা আবার চালু করা হল। এই সভার হাতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু সোলোনের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন হলেও ক্রীতদাসদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ফলে এথেন্স তখন সাধারণ স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আরও মজার হল, আগের মত সাধারণ মানুষ ও অভিজাতদের মধ্যে বিরোধ থেকে গেলেও ক্রীতদাসদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হলে এই দুই পক্ষই এক হয়ে যেত।

স্পার্টা : দক্ষিণ গ্রীসে এক জেলার নাম ল্যাকোডিয়া। এখানকার জমি খুব উর্বর, কৃষির খুব উপযোগী। পারস্য সম্রাট এই অঞ্চলটি দখল করে নেবার পর থেকে এখানে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী সময়ে এইসব বসতিগুলো একত্রিত হলে স্পার্টা শহরের গোড়া পত্তন হয়।

স্পার্টার প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব জমি আর সেই জমি চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের সঙ্গে তাদের মালিকদের বিরোধ লেগেই থাকত। সংখ্যায় যেহেতু ক্রীতদাসরাই ছিল বেশী, সেইহেতু মালিকরা ধীরে ধীরে এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলল। উদ্দেশ্য ক্রীতদাসদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

এথেন্সের মত স্পার্টাতেও ছিল বয়স্কদের নিয়ে এক পরামর্শ সভা। সভার সদস্যরাও ছিল অভিজাত।

যে সব স্পার্টান যুদ্ধ করতে পারত তাদের অন্য কোন জীবিকা গ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। ক্রীতদাসদের ভয়ে প্রত্যেক স্পার্টান সর্বদাই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করত।

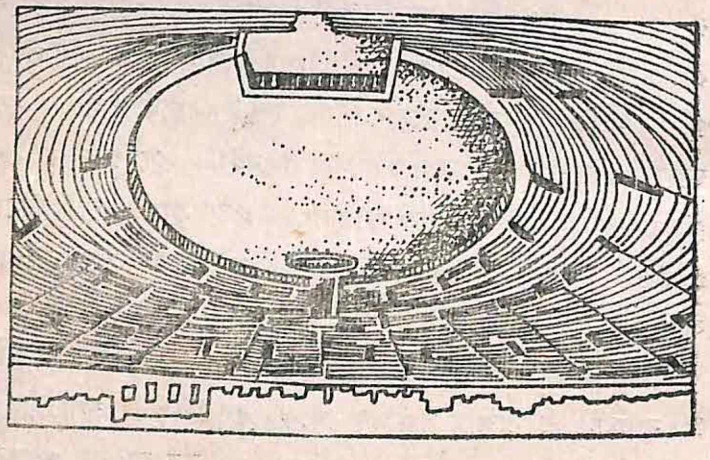
ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেক স্পার্টান শিশুকে যোদ্ধা হবার মত করে গড়ে তোলা হত। এমনভাবে তাদের গড়ে তোলা হত যেন তারা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে পারে। এজন্য তাদের কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। বয়স্কদের কথার প্রতিবাদ করা চলত না কখনই। তাদের নির্দয় করে তোলার জন্য কখন কখন কোন ক্রীতদাসকে হত্যা করে নিয়ে আসতে বলা হত। অর্থাৎ ক্রীতদাসদের সম্পর্কে ভয় থেকেই তাদের গোটা জীবনধারাই গিয়েছিল পাল্টে।

এথেন্স বনাম স্পার্টা : এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে এথেন্স ছিল শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সব দিক থেকেই খুব উন্নত। স্পার্টার ছিল একমাত্র প্রবল সামরিক শক্তি। ফলে সমগ্র গ্রীসদেশ জুড়ে এথেন্সের মর্যাদা ও খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছিল। এথেন্সের এই মর্যাদাবৃদ্ধিতে গ্রীসের অন্যান্য নগর রাষ্ট্রগুলো ক্ষেপে যায়। কারণ গ্রীকরা ছিল খুবই

স্বাধীনতাপ্রিয়। এক রাষ্ট্রের অনেক বেশী ক্ষমতা অন্য রাষ্ট্রগুলো মেনে নিতে রাজী ছিল না। তাই এথেন্সের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রগুলো ক্রমশঃ একত্রিত হতে থাকে এবং এদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে স্পার্টা। আরম্ভ হয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধই পেলোপনিসাসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ চলে অনেকদিন ধরে। যুদ্ধে স্থলপথে স্পার্টা বিশেষ নৈপুণ্য দেখায়। কিন্তু সমুদ্রের যুদ্ধে এথেন্স ছিল অনেক শক্তিশালী। শেষে এথেন্সের এক নেতা, এ্যালকিবিয়াডিস সিসিলি দ্বীপে এক অভিযান পাঠাতে উৎসাহ দেখান এবং এথেন্সের এক বিশাল নৌবাহিনীকে সিসিলি জয় করতে পাঠান হয়। অন্যদিকে স্পার্টা এবং সিরাকুজ নামে আরেকটি নগর-রাষ্ট্র একত্র হয়ে এথেন্সের বাহিনীকে আটকাতে এগিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয় হয়। এরই সঙ্গে এথেন্সের গৌরবের দিনও শেষ হয়।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব : শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এথেন্স এত উন্নত ছিল যে, সমগ্র গ্রীক-সভ্যতা এখনও এথেন্সের কাছে ঋণী।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে এথেন্সের নাট্যকার এ্যাসকাইলাস বা



মুক্তাঙ্গন থিয়েটার

সফোক্লিস আজও বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধেয়। সফোক্লিসের এক বিখ্যাত

নাটক হল 'এ্যানটিগোনে'। আর এক জনপ্রিয় নাট্যকার হলেন এ্যারিস্টোফেনিস। নাটক ও থিয়েটারের জন্মস্থান হল গ্রীসে। সে সময় ক্রীতদাসদের কথাই ছিল নাটকের মূল কথা, আর থিয়েটার হত মুক্ত অঙ্গনে। একসঙ্গে কয়েক হাজার লোক বসে থিয়েটার দেখতে পারত।

হেরোডোটাস ছিলেন এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলে শ্রদ্ধা করা হয়। তিনি গ্রীকদের সঙ্গে পারস্যের যুদ্ধের এক পূর্ণ বিবরণ রচনা করেন। তাঁর রচনা সে সময়কার নানান তথ্য জানার এক মূল্যবান উৎস।



হেরোডোটাস

থুকিডাইডিস ছিলেন এথেন্সের অপর এক গৌরব। তিনি পেলোপনিসাসের যুদ্ধের কাহিনী লিখেছিলেন।

ডেমোক্রিটাস ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি প্রথম অণু-পরমাণুর কথা আমাদের জানান। তিনি আরও বলেন, মানুষের আত্মা বলে কিছু নেই। আসলে মানুষ ভয় থেকেই ধর্ম নামক এক ধরনের বিশ্বাসকে আশ্রয় করে থাকে, অন্ধভাবে অনেক কিছু মেনে নেয়।



সক্রেটিস

সক্রেটিস ছিলেন জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। খুব সাধারণ পোষাক পরে তিনি রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতেন আর সবাইকে নতুন নতুন জ্ঞান শোনাতেন। অনেকেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। আবার অনেকেই তাঁর উপর ছিল খুবই বিরূপ। কারণ তাদের ধারণা ছিল, সক্রেটিসের এসব

নতুন জ্ঞান দেশের তরুণদের ভুলপথে চালিত করবে। তাই তারা বিষ খাইয়ে সক্রেটিসকে শেষ করে দিতে চাইল। সক্রেটিস হাসিমুখে বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর বিখ্যাত শিষ্য প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটলের খ্যাতি এখন সারা পৃথিবী জুড়ে।



এ্যারিস্টটল

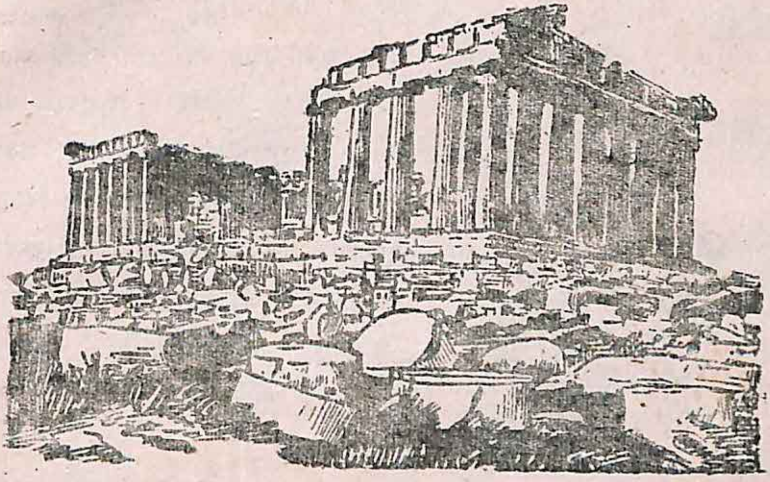
যাঁর সময়কে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয় তিনি হলেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিস ছিলেন একজন অভিজাত। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং অসাধারণ প্রতিভাবান। অসম্ভব ক্ষমতা ছিল তাঁর বক্তৃতা দেবার। এই পেরিক্লিস-ই একদিন এথেন্সের প্রধান শাসক নির্বাচিত হন। তিনি চেয়েছিলেন এথেন্সের অধীনে সমগ্র গ্রীসকে পদানত করতে। তাই তিনি একের পর এক দেশ জয় করে পরাজিত দেশকে কর দিতে বাধ্য করতেন। যারাই এই কর দিতে রাজী হত না, তাদের বিরুদ্ধে তিনি পাঠাতেন সৈন্য-বাহিনী। তিনি তাঁর সময়ে এথেন্সে অনেক মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করেন।



পেরিক্লিস

এথেন্সের জগৎ বিখ্যাত অট্টালিকাটি হল পার্থেননের মন্দির। গ্রীক দেবী এ্যাথেনার উদ্দেশ্যে এই মন্দির নির্মিত হয়। দেবী এ্যাথেনা ছিলেন জিয়ুসের কন্যা এবং অ্যাপোলো ছিলেন জিয়ুসের পুত্র। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে ছিল নানা কারুকার্য। মন্দিরের সব কারুকার্যই এত সহজ ও স্বাভাবিক যে আজও তা দর্শকদের

বিস্মিত করে। মন্দিরের ভেতরে ঘুটি হল ঘর। একটি ঘরে



পার্থেননের মন্দির

এ্যাথেনাদেবীর ১১ মিটার উঁচু বিরাট মূর্তি। অন্য ঘরে এথেন্সের



দেবী এ্যাথেনা



দেবতা অ্যাপোলো

যাবতীয় ধন-সম্পদ রক্ষিত থাকত। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্সই ছিল সবচেয়ে সুন্দর শহর।

শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এথেন্স শ্রেষ্ঠ ছিল না। এথেন্সের সংস্কৃতি ছিল সে যুগে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা দেবতা জিয়ুসের উৎসব উপলক্ষে প্রতি চার বছর অন্তর একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

করত। অলিম্পাস পাহাড়ের তলে এই ক্রীড়া উৎসব চলত। এই উৎসবে সারা গ্রীসের প্রতিটি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করত। বিজয়ী খেলোয়াড় বন্য অলিভ পাতার মুকুট পুরস্কারস্বরূপ পেত। এটা ছিল এক সম্মানের বিষয়। এই প্রতিযোগিতা গ্রীসের জনসাধারণকে একতার সূত্রে বাঁধতে সাহায্য করেছিল। এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা বর্তমানে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার রূপ পেয়েছে।


জিয়ুস

ম্যাসিডন রাষ্ট্রের উত্থান : এথেন্সের পতনের পর স্পার্টা অল্প কিছুদিনের জন্য গ্রীসের অন্য নগর-রাষ্ট্রের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলেও তা বেশী দিন টেকেনি। এরপরই আরম্ভ হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। এই লড়াইয়ের মধ্য থেকেই আরেক নগর-রাষ্ট্রের উত্থান হয়; এই রাষ্ট্রই হল ম্যাসিডন।

রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে ম্যাসিডন এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি ছোট ছোট রাজ্যগুলো দখল করেন বাহুবলে। কিন্তু বড় রাজ্যগুলো আপোসেই তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। কারণ একটি দেশ বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠলে ক্রীতদাস ও সাধারণ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এথেন্সের বিখ্যাত বক্তা ডেমোস্থিনিসের নেতৃত্বে মধ্য-গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলো ফিলিপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু ফিলিপের সৈন্য-বাহিনীর নৈপুণ্যের কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

গ্রাস জয়ের পর ফিলিপ পারস্য জয়ের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার প্রস্তুতি যখন চলছিল তখন ফিলিপ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসেন।

আলেকজাণ্ডারের রাজ্য জয়ঃ আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্য-বাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। উপকূল



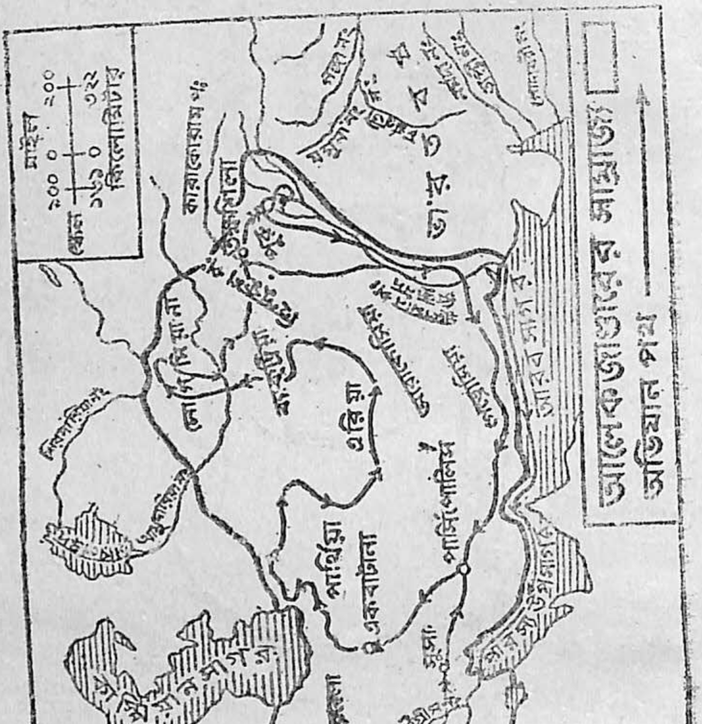
আলেকজাণ্ডার

ভাগের রাজ্যগুলো তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। বিনা যুদ্ধে তিনি দখল করেন মিশর।

এইবার তিনি অগ্রসর হলেন মেসোপটেমিয়ার দিকে। তখন পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস তাঁর সম্মুখীন হলেন। কিন্তু আলেক-জাণ্ডারের জয় রোধ করা গেল না।

তারপর মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য জয় করে তিনি উপস্থিত হলেন ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশে। এখানে সিন্ধুনদের তীরে পুরুরাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধে পুরুরাজ পরাজিত হন। কিন্তু যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যবাহিনী আর যুদ্ধ করতে রাজী হল না। তাই আলেকজাণ্ডারকে এখান থেকেই ফিরতে হয়। বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য তিনি ব্যাবিলনে অবস্থান করতে থাকেন, এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আলেকজাণ্ডারের পরবর্তীকালে গ্রীস :—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা



নিয়ে তাঁর প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে তুমুল বিরোধ দেখা দেয়। গ্রীসে ম্যাসিডনের ক্ষমতা তখনো খানিকটা বজায় থাকলেও অন্যান্য

রাষ্ট্রগুলো আরও ছোট আর শক্তিহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত রোম ম্যাসিডনের প্রাধান্য খর্ব করে গ্রীস দেশে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পরাজিত হলেও গ্রীস দেশ নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিয়ে রোম দেশকে প্রভাবিত করেছিল। এখানেই হল গ্রীক সভ্যতার এক বিস্ময়কর জয়।

ছয়ঃ রোম সাম্রাজ্য	**পাঠবিন্যাস ঃ** (১) রোমের উৎপত্তি (২) প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান (৩) অভিজাতদের ক্ষমতা দখল (৪) কার্থেজের সঙ্গে বিরোধ (৫) রোমের ক্রীতদাস বিদ্রোহ (৬) জুলিয়াস সিজারের উত্থান (৭) অটক্‌-ভিয়ানের শাসন (৮) রোমের পতন (৯) খ্রীষ্টধর্মের প্রসার

গ্রীসের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ আপেনাইন পর্বতমালা। সাগর আর পর্বতমালার মাঝখানে রয়েছে বিস্তৃত সমভূমি। এই সমভূমিরই মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে চলেছে টাইবার নদী। গ্রীকরা এই অঞ্চলেই একদা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারাই প্রথম এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল 'ইটালিয়া' যা এখন ইটালী নামে পরিচিত। টাইবার নদীর নিম্নাঞ্চলেই এখানকার প্রথম গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর নাম ল্যাটিন গোষ্ঠী। প্রাচীন ইটালীর ইতিহাসে এই গোষ্ঠীর দান অনেকখানি।

রোমের উৎপত্তি ঃ ল্যাটিনরা যে অঞ্চলে বসবাস করত সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক ছোট শহর গড়ে ওঠে। টাইবার নদীর তীরে এই শহরের নামই রোম। নদীর তীর ঘেঁষে সেই সময় প্রাচীর দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী আক্রমণ থেকে অধিবাসীদের রক্ষা করা।

তখন বাড়ী-ঘর ছিল কাঠের তৈরী, ছাদের জন্য ব্যবহার করা হত খড়। রাস্তাঘাট ছিল সরু সরু। অধিকাংশ লোকই কৃষিকাজ ও পশুপালন করত। অন্য জীবিকার লোকও কিছু কিছু ছিল।

যাইহোক, গল্প আছে, রোমুলাস নামে এক রাজার নাম থেকেই আসে রোম নামটি। এটা কতদূর সত্য তা বলা যায় না।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান: প্রাচীনকালে রোমের লোকেরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করত। পরে ক্রমশঃ গোষ্ঠী ভেঙ্গে পরিবার তৈরী হয়। এইসব পরিবারের যারা বংশধর তাদের বলা হত প্যাট্রিসিয়ান। শব্দটি এসেছিল ল্যাটিন 'প্যাটার' থেকে যার অর্থ পিতা। অর্থাৎ প্যাট্রিসিয়ান যারা তারা এই বলে গর্ব বোধ করত যে, প্রাচীন রোমের স্রষ্টাদের বংশধরই হল তারা।

কিন্তু পরবর্তীকালে রোমের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। নানান জায়গা থেকে লোক এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। রোমের নবাগত যারা তাদের বলা হত প্লেবিয়ান। বিদেশী বলে রোমে এরা কোন সুযোগ-সুবিধেই পেত না।

রোমের শাসনব্যবস্থা: কথিত আছে, একবার রোমের এক নিষ্ঠুর রাজাকে দেশের লোক দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর লোকেরা দুই জন প্যাট্রিসিয়ান নির্বাচন করে দেশ শাসনের ভার তাদের দেয়। তাছাড়া বয়স্কদের নিয়ে গঠিত এক সমিতি ছিল, যাকে বলা হয় সেনেট। সেনেটের ছিল অনেক ক্ষমতা। এদের হাতে ছিল সৈন্য-বাহিনী, এরা দেশের ধন-সম্পদ তদারক করত, প্রয়োজনমত যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিত, বা শান্তি স্থাপন করত। এই শাসন ব্যবস্থাকে বলা হত 'রিপাবলিক' ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থায় প্লেবিয়ানদের সব দায়িত্ব পালন করতে হলেও তাদের কোন অধিকার ছিল না। তারাও প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করল। তারা সৈন্যবাহিনী এমন কি রোম ত্যাগের হুমকি দিল। এতে ভয় পেল প্যাট্রিসিয়ানরা। কেননা প্লেবিয়ানরা সত্যি সত্যিই চলে গেলে সৈন্যবাহিনী হয়ে যাবে দুর্বল। ফলে তাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধে দেওয়া হল। কিন্তু প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে সমান সুযোগ-সুবিধে পেতে তাদের প্রায় দুশো বছর লড়াই করতে হয়েছিল।

অভিজাতদের ক্ষমতা দখল : রোমে দেশ শাসনের কাজ ছিল অবৈতনিক। ফলে যারা গরীব তারা এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সুযোগই পেত না। কেবলমাত্র প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে যারা ছিল ধনী, জমি ও ক্রীতদাসের মালিক, তাদের হাতেই ছিল অফুরন্ত সময়। তাই তারা বিনা বেতনে দেশ শাসনের কাজে এগিয়ে আসত। কালে কালে এরাই পুরুষানুক্রমে দেশ শাসন করে যেতে লাগল। ফলে সৃষ্টি হল এক নতুন শাসকগোষ্ঠী, যেখানে প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান উভয়েই ছিল। এদের বলা হল অভিজাত।

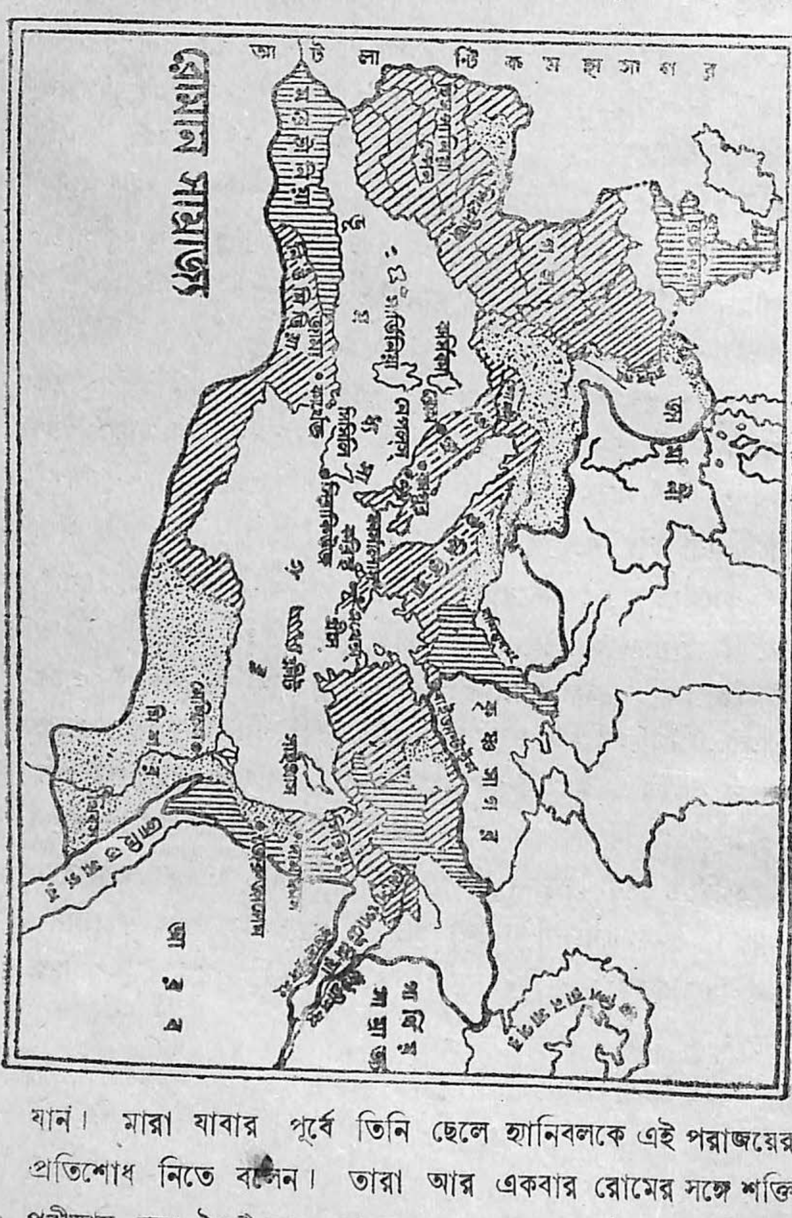
এই অভিজাতদেরই আরও বেশী লোভ মেটাতে রোম ধীরে ধীরে সমগ্র ইটালী দখল করে নেয়। যত বেশী নতুন জায়গা দখল করা যায় তত বেশী নতুন কৃষির জমি অভিজাতরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে লাগল।

কার্থেজের সঙ্গে বিরোধ : আরও বেশী জমি দখল করার লোভ থেকেই রোমকে কার্থেজের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হয়।

রোমের কাছেই সিসিলি। সিসিলির জমি খুব উর্বরা। প্রচুর আঙ্গুর, কমলালেবু আর জলপাই জন্মে। তাই সিসিলির ওপর প্রচণ্ড লোভ রোমের। আবার আগে থেকেই সিসিলিতে ছিল গ্রীসের উপনিবেশ। বিশেষ করে কার্থেজ কিছুতেই এই দ্বীপটি রোমের হাতে ছেড়ে দিতে তৈরী ছিল না। তখনকার দিনে কার্থেজ ছিল এক ব্যস্ত বন্দর। রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের। হাতে ছিল প্রচুর ক্রীতদাস। আর ছিল সুদক্ষ নৌবাহিনী। তাদের এই শক্তি রোমের পক্ষে ছিল বিশেষ বিপদের।

২৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোম সিসিলি আক্রমণ করে। ফলে কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রোমানরা কার্থেজকে বলতো পিউনিসি। তাই এই যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ। মোট চারটি পিউনিক যুদ্ধের প্রথমটিতে রোম জয়লাভ করে। তারা সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা দখল করে নেয়। কার্থেজ পরাজিত হলেও এই

পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারল না। কার্থেজের সেনাপতি ছিলেন হ্যামিলকার বার্কা। রোমের কাছে হেরে দুঃখে তিনি মারা



যান। মারা যাবার পূর্বে তিনি ছেলে হ্যানিবলকে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বলেন। তারা আর একবার রোমের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগলো। এবার কার্থেজ এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল।

তাদের সেনাপতি হলেন হ্যামিলকার বার্কার পুত্র এক বিখ্যাত বীর হ্যানিবল। কার্থেজের সৈন্যরা স্পেন দখল করে নেওয়াতে রোমের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে গেল। এই যুদ্ধই দ্বিতীয় পিউনিকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় ২১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এইবার যুদ্ধে সাফল্যলাভ করতে লাগল কার্থেজ। আর এই সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্ব হ্যানিবলের, তাঁর যুদ্ধ চালনার অপূর্ব নৈপুণ্যের গুণে রোম তছনছ হয়ে গেল। অনেক ক্ষতি হয়ে যায় রোমের এই যুদ্ধের ফলে। কিন্তু যুদ্ধের শেষ দিকে রোম সেনাপতি পিসিও কার্থেজ আক্রমণ করল। হ্যানিবল দেশে ফিরে রোমের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে গেলেন। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন। কার্থেজবাসীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। রোমের লোকেরা কার্থেজের শক্তি বৃদ্ধির ভয়ে একদিন পুনরায় কার্থেজ আক্রমণ করে বসল। এটা তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।



হ্যানিবল

এ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় হল রোমেরই। কার্থেজের শক্তি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তারা রোমের যে সব জায়গা দখল করে নিয়েছিল তা সবই রোমকে ফিরিয়ে দিতে হল। শুধু তাই নয়, কার্থেজের শক্তি চিরতরে ধ্বংস করার জন্য রোম কার্থেজ শহরটাই তছনছ করে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিল। কার্থেজ নগরী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

এরপর রোম তাদের কর্তৃত্ব ম্যাসিডোনিয়া ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত

করেছিল। নতুন নতুন জায়গা দখল করে লুঠতরাজ করে রোম প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করলো।

রোমে ক্রীতদাসের বিদ্রোহ: রোমানরা রাজ্য জয় করে যে সব ধন-সম্পদ লুঠ করত তা দেশে ক্রীতদাসদের মালিক যারা তারাই ভাগ করে নিত। সৈন্যবাহিনীর প্রধান যারা তারাও প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হত। রোমান ব্যবসায়ীরাও ক্রীতদাসের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। আর রোমে কল-কারখানা, খনি, কৃষিকাজ ও জাহাজে প্রচুর ক্রীতদাস নিযুক্ত ছিল।



রোমের ক্রীতদাস

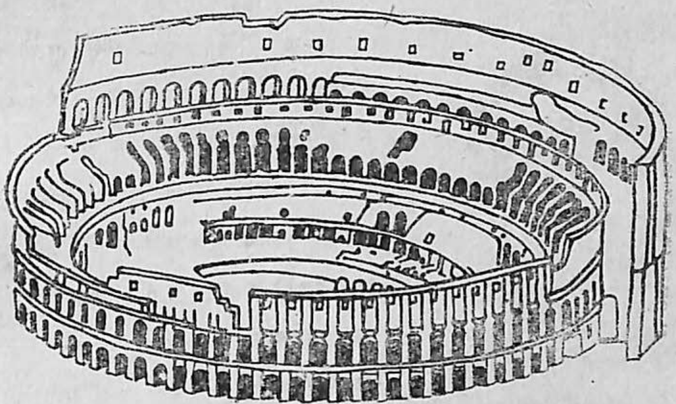
এইসব ক্রীতদাসরা অমানুষিক পরিশ্রম করত। তাদের ওপর অত্যাচারও হত অমানুষিক। বিনিময়ে তারা খাওয়া-পরার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও পেত না। তখনকার দিনে ক্রীতদাস যেহেতু ছিল সস্তা সেহেতু তাদের ওপর অত্যাচার করতে কোন অসুবিধে ছিল না।

রোমানরা আমোদ-প্রমোদের জন্যও দুজন ক্রীতদাসকে বা কোন বন্য জন্তুর সঙ্গে কোন ক্রীতদাসকে লড়িয়ে দিত। এমন লড়িয়ে ক্রীতদাসদের বলা হয় গ্ল্যাডিয়েটর। এই খেলা দেখার জন্য তারা এক সুউচ্চ প্রাসাদ বানিয়েছিল। তাকে বলা হত কলোসিয়াম।

সুতরাং এ ধরনের অত্যাচার ক্রীতদাসদের পক্ষে দীর্ঘকাল মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করতে লাগল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সেই বিদ্রোহ, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্পার্টাকাস।

একবার একদল গ্ল্যাডিয়েটর জেল ভেঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ

করার পরিকল্পনা করে। তারা স্পার্টাকাসকে তাদের নেতা নির্বাচন



কলোসিয়াম

করে। স্পার্টাকাসের ছিল যেমন স্বাস্থ্য তেমন ছিল তার সাহস আর বুদ্ধি।

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যখন বিদ্রোহীরা সাফল্যলাভ করতে থাকে তখন সারা দেশের ক্রীতদাসদের এক নতুন উৎসাহ দেখা দেয়। তারা দলে দলে এসে স্পার্টাকাসের দলে যোগ দেয়। ফলে স্পার্টাকাস এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর দলের মধ্যে মতভেদের জন্যই স্পার্টাকাস শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন নি। স্পার্টাকাস ব্যর্থ হলেও তাঁর চেষ্টা কিন্তু একেবারে বিফল হয় নি। ক্রীতদাসের মালিকরা এই প্রথম ক্রীতদাসদের ভয় পেতে লাগলো। ফলে রোমের শাসনব্যস্থায় এল আর এক পরিবর্তন।

জুলিয়াস সীজারঃ ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের ফলে রোমের শাসন ক্ষমতা ক্রীতদাসদের মালিকদের হাত থেকে সেনাপতিদের হাতে চলে এল। মালিকরাও চাইছিল একজন শক্তিশালী সেনাপতি শক্ত হাতে রোম শাসন করুক। তাহলে তাদের স্বার্থে কখনও আঘাত আসবে না। এই সময় যে কয়জন সেনাপতি রোমের

ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জুলিয়াস সীজার।


জুলিয়াস সীজার

এক অভিজাত প্যাট্রিসিয়ান পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। অদ্ভুত ছিল তাঁর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা। অল্প বয়সেই তিনি গলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমেই গোটা গল দেশটি জয় করার জন্য প্রস্তুত হলেন। গলেরা তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিলেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে। এরপর সীজার ব্রিটেন দেশ অধিকার করলেন। এই সময় রোমের সেনাপতি ছিলেন পম্পে। পম্পে ক্রীতদাস বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সিজারের ক্ষমতা বাড়ছে দেখে তাঁর ভয় হল। তিনি সীজারকে রোমে আসতে নিষেধ করলেন। সীজার জোর করে রোমে ঢুকলেন। ফলে সীজারের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। কিন্তু সীজারের কাছে তাঁকে হার স্বীকার করতে হল। ফলে সীজারের পক্ষে রোম দখল করা সহজ হয়ে গেল।

রোম দখল করার পর তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি সেনেটের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন। ফলে তাঁর ক্ষমতা হয়ে গেল সীমাহীন। কিন্তু সেনেটের কোন কোন সদস্য সীজারের এত ক্ষমতাকে মেনে নিতে রাজী হল না। এই সব সদস্যদের নেতা ছিলেন ব্রুটাস নামে রোমের এক ক্রীতদাসের মালিক। তারা সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করল। এই ষড়যন্ত্রেই ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেনেটের এক সভা চলাকালে সীজারকে হত্যা করা হয়।

সীজারকে হত্যা করার পর ষড়যন্ত্রকারীরা আবার রোমে রিপাবলিক শাসনের কথা ঘোষণা করল। কিন্তু দেশের মানুষ

রিপাবলিক শাসনের নামে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে ক্ষমতা থাকাটা আর মেনে নিতে পারল না। ফলে আরম্ভ হল আর এক ষড়যন্ত্র সীজারের হত্যাকারীদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। এবারের ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিলেন এ্যাণ্টনী নামে এক বিখ্যাত যোদ্ধা এবং অক্টাভিয়ান নামে সীজারের এক আত্মীয়। অক্টাভিয়ান ভাল যোদ্ধা না হলেও ছিলেন খুবই চালাক। এদের দুজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব না থাকলেও সীজারের হত্যাকারীদের শায়েস্তা করতে উভয়েই একত্রিত হয়েছিলন। যাইহোক, এ্যাণ্টনী ও অক্টাভিয়ান যুক্ত শক্তির কাছে হত্যাকারীরা পদানত হয়। ব্রুটাস আত্মহত্যা করেন।


অক্টাভিয়ান

এইবার আরম্ভ হল এ্যাণ্টনী আর অক্টাভিয়ানের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু অক্টাভিয়ানের বুদ্ধির কাছে এ্যাণ্টনী পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করেন। ক্ষমতা দখল করার পর অনায়াসে অক্টাভিয়ান মিশর দেশকে রোম রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন।

অক্টাভিয়ানের শাসন ঃ ক্ষমতা পেয়েও অক্টাভিয়ান প্রথমে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন না। সীজারকে তিনি দেখেছিলেন। তিনি জানতেন সম্রাটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রোমানরা কখনো মেনে নেবে না। তাই তিনি রিপাবলিক শাসনব্যস্থার সব ধরন-ধারণই বজায় রাখলেন। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে দীর্ঘ ষোল বৎসর তিনি দেশ শাসন করেছিলেন।

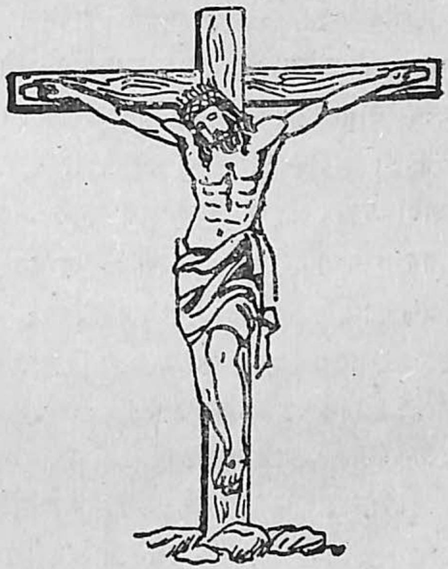
তিনি নিজ বুদ্ধিবলে আস্তে আস্তে সমস্ত বিরোধীদের সেনেট থেকে বের করে দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যাদের পছন্দ করতেন কেবল তারাই সেনেটের সদস্য হতে পারত। ফলে সেনেটে তাঁর সিদ্ধান্তই সব সময়ই গৃহীত হত। সেনেট তাঁকে অগাস্টাস্ আখ্যা দিয়েছিল। অগাস্টাসের অর্থ 'পবিত্র'।

এইভাবে সেনেট ইত্যাদি বজায় রেখেও অক্টাভিয়ান দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় থেকেই অভিজাতদের শাসন শেষ হলো। এরপর থেকে রাজারাই দেশ শাসন করতে লাগলেন। অভিজাতরাও ক্রমশঃ নতুন ব্যবস্থা মেনে নিতে লাগল। কারণ এই ব্যবস্থায় দেশে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা যেমন সম্ভব হল তেমনি যে কোন বিদ্রোহ দমনও সহজ হল।

রোম সাম্রাজ্যের পতন ঃ রাজতন্ত্রের অধীনে রোমকে কেন্দ্র করে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। এই দুর্বলতার সবচেয়ে বড় কারণই হল, রোম সাম্রাজ্য ছিল ক্রীতদাসদের ওপর অনেক বেশী নির্ভর। ক্রীতদাসেরা দেশের সব কাজই করত বটে; কিন্তু কোন কাজই মনপ্রাণ দিয়ে করত না। কেননা ভাল করে বেশী কাজ করলেও তাদের অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাই তারা সব কাজেই ফাঁকি দিতে লাগল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার আর সুযোগ থাকল না।

এই অবস্থায় জমির মালিকরা তাদের জমি ক্রীতদাসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে লাগলেন। শুধু শর্ত থাকল এই যে, উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ জমির মালিককে দিতে হবে। মালিকরা চাষের জন্য সবকিছু যোগান দিত। এই ধরনের ক্রীতদাসদের বলা হত কোলন। কিন্তু এতেও অবস্থার পরিবর্তন হল না। ক্রীতদাস বা কোলন উভয়েরই জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল নানা অত্যাচারে অবিচারে। মাঝে মধ্যে তারা বিদ্রোহও করত। আবার সর্বশক্তিমান সম্রাট সেই সব বিদ্রোহ দমনও করতেন।

খ্রীষ্টধর্মের আগমন ঃ অবস্থার চাপে ক্রীতদাসরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ করে কোন লাভ নেই এটা তারা বুঝেছিল। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠতে থাকে যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে তারা এ জীবনের অত্যাচারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এমন দেবতার সন্ধান নাকি শীঘ্রই পাওয়া যাবে, যিনি তাদের মুক্তির পথের নির্দেশ দিতে পারবেন।



ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট

শোনা গেল, দূর প্যালেস্টাইনে সত্যি এমন এক দেবতা আছেন। তাঁর নাম যীশুখ্রীষ্ট। তিনি পৃথিবীতেই এসেছেন, যারা গরীব, দুঃখী এবং অত্যাচারিত তাদের বন্ধু হয়ে। এও শোনা গেল, এই ভগবানকেও এক রোমান শাসক ক্রূশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। কিন্তু হত্যাকালেও তিনি হাসিমুখে সব অত্যাচার মেনে নিয়েছেন এবং অপরাধীদের ক্ষমা করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাই রোমের যারাই ছিল অত্যাচারিত তারাই এই ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। যীশুখ্রীষ্টের এই ধর্মকে যারা মানলো তাদের বলা হল খ্রীষ্টান, ধর্মের নাম হল খ্রীষ্টধর্ম। সমগ্র এশিয়া মাইনর, মিশর, গ্রীস ও ইটালীতে এই ধর্ম গরীব ও অত্যাচারিতদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। খ্রীষ্টানরা রাজাকে ভগবান বলে মানতে অস্বীকার করল। তারা মেনে নিল ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

কিন্তু এই নতুন ধর্ম কেবলমাত্র গরীবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল

না, ধনীরাও এক সময় এই ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। তখন রোম সাম্রাজ্যের খুবই দুঃসময়। বার বার বিদ্রোহে ধনীরা তাদের ধন-সম্পদ হারাতে লাগল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলো বার বার রোম আক্রমণ করে অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলল। ফলে ধনীরাও নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেল। বিদ্রোহের ও আক্রমণের ভয়ে তারাও সবসময় তটস্থ হয়ে থাকত। এ অবস্থায় তারাও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সুখের আশায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। তা ছাড়া তারা দেখল, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে ক্রীতদাসরা আগের তুলনায় অনেক নরম ও সভ্য হয়েছে। ফলে এই ধর্মের প্রতি তাদের আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের কাছে এই ধর্ম খুবই লোভনীয় হয়ে উঠল। কেননা খ্রীষ্টান হলে বিদেশী কোন খ্রীষ্টানের কাছে থেকেও যথেষ্ট আদর যত্ন পাওয়া যেত। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তাদের তো বিদেশে যেতে হতই।

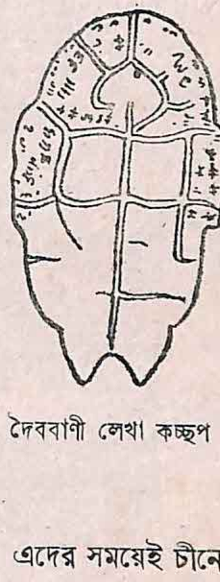
রোমরাজ্যের একজন রাজা কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। রাজা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে রোমের প্রজারাও দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।

ফলে অল্প দিনের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও ধনীদের প্রাধান্য বেড়ে গেল। খ্রীষ্টধর্মের পুরোহিত যাঁদের বলা হয় বিশপ, তাঁরা ধনীদের থেকেই নির্বাচিত হতে লাগলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ধর্মীয় উপাসনার জন্য গীর্জা। গীর্জাগুলোও ক্রমশঃ হয়ে উঠল মহাশক্তিশালী। সম্রাটদের উপায় ছিল না এদের অবজ্ঞা করার।

সাত : চীন দেশের কথা	**পাঠবিন্যাস :** (১) শাং বংশ : চীন সাম্রাজ্য : চীনের প্রাচীর : (২) কনফুসিয়াস ও তাঁর শিক্ষা

শাং বংশ : চীন সাম্রাজ্য : চীনের প্রাচীর : প্রাচীন কালে চীনে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করে। প্রথম দিকে শিয়াবংশ চারশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করে। এর পর শাং বা জিন বংশ আসে।

এই রাজবংশ প্রায় সাড়ে ছয়শ' বছর দেশশাসন করে। এই সময় চীন দেশ খুব ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। চারদিকে ছিল অনেক সামন্ত রাজা। তাঁরা একজনকে প্রধান রাজা বলে মানতেন বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন স্বাধীন। প্রধান রাজার খুব একটা গুরুত্ব ছিল না। পরে আস্তে আস্তে সামন্ত রাজাদের ক্ষমতা কমিয়ে প্রধান রাজা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই চীনদেশে সত্যিকার ঐক্য গড়ে উঠতে থাকে। শাং বংশের রাজত্বকালে চীনে দৈববাণীর খুব চলন ছিল। তারা কচ্ছপের খোলায় প্রশ্ন লিখে তা রেখে দিত। ঐ কচ্ছপের খোলায় পরে তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখা হয়ে যেত। এগুলোকে কচ্ছপের দৈববাণী বলা হত। এমন কচ্ছপের খোলা এদেশের মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। শাং বংশের শেষ রাজা ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর এবং বোকা। পরবর্তী রাজবংশ চৌ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৱু হোয়াং-এর কাছে পরাজিত হয়ে রাজপ্রাসাদে নিজেকে পুড়িয়ে মারেন।



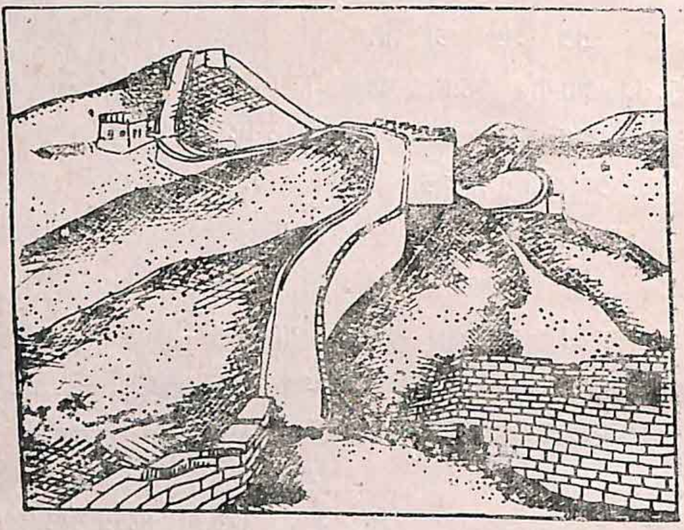
দৈববাণী লেখা কচ্ছপ

চৌ বংশ রাজত্ব করে প্রায় নশো বছর। এদের সময়েই চীনে প্রথম শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়েই চীনের দুই বিখ্যাত পণ্ডিত কনফুসিয়াস ও লাও-সে চীনে বাস করতেন।

চৌ বংশের পরে আসে চীন বংশ। এই বংশের নাম অনুসারেই দেশের নাম হয় চীন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন শি হুয়াংতি। তাঁকে বলা যায় চীনের প্রথম সম্রাট। তাঁর ধারণা ছিল ছিল, তাঁর আগে যাঁরা দেশশাসন করে গেছেন তাঁরা সবাই অপদার্থ। তাই তিনি আগেকার সমস্ত ইতিহাস পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে চীনের অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্র পোড়ান হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের যাঁরা সত্যিকার পণ্ডিত তাঁরা অনেক ভাল ভাল মূল্যবান

বই লুকিয়ে ফেলেছিলেন। এটা সেদিন তাঁরা করেছিলেন বলেই এখন আমরা চীনের প্রাচীন কালের নানা কথা জানতে পারি। নতুবা চীনের প্রাচীন ইতিহাস জানা আরও অনেক কষ্টকর হয়ে যেত।

শি হুয়াংতির বিখ্যাত কাজ হল, তিনি রাজধানী পিকিং শহরের চারদিকে এক বিরাট প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ করেন। এই প্রাচীর এখনো বিশ্বের এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চীনের উত্তর থেকে হূণ প্রভৃতি অসভ্য জাতি বার বার আক্রমণ করে লুটপাট করে চলে যেত। তাদের আটকাবার জন্যই শি হুয়াংতি এই প্রাচীর



চীনের প্রাচীর

তৈরীর কথা ভেবেছিলেন। শুধু পিকিংয়ের চারদিকে নয়, চীনের উত্তর দিকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ধরে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা এই বিখ্যাত প্রাচীর। প্রাচীরটি ২৫ ফুট উঁচু এবং এত চওড়া যে ছয়জন লোক ঘোড়ায় চড়ে অনায়াসে ছুটে যেতে পারে পাশাপাশি। অনুমান করা হয় যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২১৪ বছর আগে এই প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ হয়। শেষ হতে লেগেছিল কয়েক শ' বছর। এই প্রাচীর নির্মাণ শি হুয়াংতির এক বিখ্যাত কীর্তি। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট অশোকের সময়কার।

কনফুসিয়াস ও তাঁর শিক্ষা : চীন দেশে যে কয়েকজন মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন কনফুসিয়াস।

তিনি এক অভিজাত কিন্তু দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন। খুব ছোট্ট বেলায় তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর মা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তোলেন। বড় হয়ে তিনি তাঁর নিজের প্রদেশ লু-তে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য এক স্কুল খোলেন। চীন দেশের রাজার খুব বড় বড় লাইব্রেরি ছিল। তখনও শি-হুয়াংতি রাজা হন নি। তাই লাইব্রেরিগুলো ঠিকই ছিল। তিনি রাজধানী গিয়ে রাজার অনুমতি নিয়ে লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এখনকার মত তখনকার দিনে বইপত্র তো আর ছাপানো ছিল না। বাঁশের ছালের ওপর তুলি দিয়ে অক্ষর এঁকে এই সব বইপত্র তৈরী হয়েছিল। সেসব বই পড়া শেষ করে তিনি দেশে ফিরলেন।


কনফুসিয়াস

তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে লু-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করা হল। তাছাড়া তিনি সারা চীন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন তাঁর মতামত প্রচার করার জন্য।

কনফুসিয়াসের শিক্ষার প্রধান কথাই হল কেমন করে ভদ্র জীবন-যাপন করা যাবে। তিনি বলতেন দেশকে মহান করে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে ভদ্র আচার-আচরণ শিখতেই হবে। সবাই যদি ভদ্র হয়ে ওঠে তাহলে দেশও ভদ্র হয়ে উঠবে।

দেশের শাসনব্যবস্থায় তাঁর শিক্ষার ছিল বিশেষ মূল্য। গোটা ব্যবস্থাটাই কনফুসিয়াসের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আজকের

চীনেও এই প্রভাব রয়ে গিয়েছে। চীনের জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অনেকখানি। প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে তিনি স্থির করেছিলেন কিভাবে চললে চীন জাতি এক মহান জাতিতে পরিণত হতে পারে। তাই চীন জাতির পক্ষে কনফুসিয়াসকে ভুলে যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়।

● প্রাচীন সভ্যতাগুলো সম্পর্কে মনে রাখার কথা ●

প্রাচীন যুগে মানব সভ্যতার বিকাশে ব্যাবিলন মিশর গ্রীস ও চীনের সভ্যতার মূল্য অসাধারণ। ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির আইন সমাজজীবনে এনেছিল একটা সুব্যবস্থা। গ্রীসের এথেন্সেই প্রথম রচিত হয় মানুষের সত্যিকার ইতিহাস। রোম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সঙ্গেই মানুষের সভ্যতা এক নতুন গতিপথ খুঁজে পেল। চীনের মহা পণ্ডিত কনফুসিয়াস সমাজব্যবস্থাকে ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুশীলনী

(ক) **রচনামূলক প্রশ্ন :—**

১। লোহার ব্যবহার জেনে মানুষের জীবনে কি কি পরিবর্তন এল? পরিবর্তন এসেছিলই বা কেমন করে?

২। হামুরাবির কয়েকটি আইন কেমন ছিল লেখ। এই আইনগুলো থেকে তখনকার দিনের কোন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। ব্যাবিলনে পুরোহিতদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল কেন? এর ফল কি হয়েছিল?

৪। মিশরের সৈন্যবাহিনীর গঠন কেমন ছিল? পর পর যুদ্ধে জেতার ফল কি হয়েছিল?

৫। কোন সভ্যতাকে ইজিপ্সান সভ্যতা বলে? কেন বলা হয়? এই সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। গ্রীক দেশের কোন মহাকবি দুটি মহাকাব্য রচনা করেছেন? মহাকাব্য দুটি কি কি? মহাকাব্য দুটি এখনো এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৭। গ্রীকরা উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহী হয়েছিল কেন? বিদেশে তারা কিভাবে উপনিবেশ স্থাপন করতো? এইসব উপনিবেশের গুরুত্ব কি?

৮। এথেন্সের শাসনব্যবস্থাকে কি বলা হত? এই শাসনব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত?

৯। কোন সময়কে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়? কেন বলা হয়?

১০। রোম ও কার্থেজের যুদ্ধকে কি বলা হয়? তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল কেন? এই যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল?

১১। রোমের ক্রীতদাসগণ বিদ্রোহ করেছিল কেন? একজন বিদ্রোহী ক্রীতদাস নেতার নাম বল। বিদ্রোহের ফলাফল কি হয়েছিল?

১২। জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন? তিনি রোমের শাসনব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন আনেন? শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হলেন কেন?

১৩। রোমে খ্রীষ্টধর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কেন? ধনীরাও এই ধর্ম গ্রহণে ফলাফল কি হয়েছিল?

১৪। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য কি কি ছিল? তিনি কিভাবে জীবন যাপন করতে বলেছিলেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। ব্যাবিলনের প্রাচীন অধিবাসীদের কি বলা হত? তারা কোথেকে এসেছিল?

২। ব্যাবিলনের প্রধান দেবতার নাম কি? তাঁর মন্দির কি দিয়ে তৈরী হয়েছিল? দেখতে কেমন ছিল?

৩। কাকে মিশরের নেপোলিয়ান বলা হয়? তিনি কোন কোন দেশ জয় করেছিলেন?

৪। জরথুস্ত্র কে ছিলেন? তিনি কি কি বলতেন?

৫। ডেমোক্রিটাস কে ছিলেন? তিনি আমাদের জীবন সম্পর্কে কি বলেছিলেন?

৬। এথেন্সের জগৎ-বিখ্যাত অট্টালিকাটির নাম কি? এই অট্টালিকা কার উদ্দেশ্যে নির্মিত? অট্টালিকার গঠন কেমন ছিল?

৭। আজকের অলিম্পিকের সূত্রপাত কিভাবে? তখনকার দিনে বিজয়ী প্রতিযোগীদের কি পুরস্কার দেওয়া হত!

৮। **সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—**
তৃতীয় থুথমিস, আবেস্তা, কাইরাস, দরায়ুস, চীনের মহাপ্রাচীর, অকটাভিয়ান, গ্লাডিয়েটর, পেলোপনেশিয়ার যুদ্ধ, প্যাট্রিসিয়ান, প্লেবিয়ান।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(অ) প্রাচীন এথেন্সের শাসনব্যবস্থাকে বলা হত —।

(আ) এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধকে বলা হয় — যুদ্ধ।

(ই) বিখ্যাত এ্যান্টিগোনে নাটকের রচয়িতা হলেন —।
(ঈ) দার্শনিক — বিষপান করে প্রাণত্যাগ করেন।
(উ) পার্থেনন হল — দেবীর মন্দির।
(ঊ) — নাম থেকেই দেশের নাম হয় রোম।
(ঋ) — দ্বীপের অধিকার নিয়ে রোম ও কার্থেজের বিবাদ আরম্ভ হয়।

২। 'ক' স্তম্ভের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামগুলোর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে লিখিত তাঁদের পরিচয়গুলো মেলাও :—

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
সফোক্লিস	রাজনৈতিক নেতা
হেরোডোটাস	নাট্যকার
ডেমোক্রিটাস	দার্শনিক
সক্রেটিস	ঐতিহাসিক
পেরিক্লিস	বৈজ্ঞানিক

৩। ঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :—
(ক) মিশরের নেপোলিয়ান বলা হয় তৃতীয় থুথমিস/দ্বিতীয় সেটিকে।
(খ) কল্যাণের দেবতা হলেন অরমুজ্দ/অহিরমান।
(গ) ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদীদের/পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ।
(ঘ) রোম নগরী স্থাপন করেছিলেন রেমুস/রোমুলাস।
(ঙ) হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে গড়ে ওঠে রোম সভ্যতা/চৈনিক সভ্যতা।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১) হোমারের লেখা মহাকাব্য দুটি কি কি?
২) ইরাণের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম বল।
৩) কার্থেজ কোথায়?
৪) স্পার্টাকাস কে ছিলেন?
৫) চীনের প্রাচীর কে নির্মাণ করেছিলেন?
৬) ব্যাবিলনীয়দের দেবতার নাম কি?
৭) গ্লাডিয়েটর কাদের বলা হত?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। একটি মানচিত্র এঁকে তাতে পারস্যের সম্রাট দরায়ুসের সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দেশ কর।
২। একটি মানচিত্র এঁকে তাতে আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের গতিপথ দেখাও।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের কথা :	**পাঠবিন্যাস :** (১) আর্যদের ভারত আগমন (২) বেদ (৩) আর্যদের সমাজ : ধর্ম : রাষ্ট্রব্যবস্থা (৪) জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান (৫) ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের চেষ্টা (মৌর্য-কুষাণ) (৬) প্রাচীন বঙ্গের কথা (৭ বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক (৮) ভারত সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ (৯) প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি

বিষয় সংকেত : পৃথিবীর নানা দেশ যখন নানা ভাবে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভারতবর্ষ মগ্ন হয়ে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনধারার সাধনায়। পরে সবাই অবাক হয়ে যায় সেই সাধনার ধরন দেখে। আমরা এবারে সেই সাধন কাহিনী জানবো।

আর্যদের ভারত আগমন : সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করার আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল আর্যদের ভারতে আসার সময় থেকেই। এই আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল বাইরে থেকে, খুব সম্ভব উত্তর-পূর্ব ইরাণ এবং কাস্পিয়ান সাগরের আশ-পাশ অঞ্চল থেকে। যারা ভারতে এল তাদের বলা হল ভারতীয় আর্য।

বেদ : ভারতে এসে তারা প্রথম বসতি স্থাপন করে পাঞ্জাব অঞ্চলে। তারপর তারা ক্রমশঃ ভারতের আরও ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় দিল্লীর উত্তরে সরস্বতী নামে এক নদী প্রবাহিত ছিল। এখন সেই নদী একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছে। এই অঞ্চলে আর্যরা দীর্ঘকাল বসবাস করে। এখানে থাকাকালেই তারা 'বেদ' নামে নানা স্তোত্রের এক গ্রন্থ সংকলন করে। এই বেদ পাঠ করে আমরা আর্যদের জীবন-যাপন পদ্ধতির এক পরিষ্কার বিবরণ জানতে পারি

আর্যদের সমাজ : ধর্ম : রাষ্ট্রব্যবস্থা : আর্যরা এদেশে এসেছিল পশুপালক হিসেবেই। পশুপালনই ছিল তাদের জীবনধারণের উপায়। তাই তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। ধীরে ধীরে

তারা কৃষিকাজের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তারপর থেকেই তারা গড়ে তুলতে থাকে গ্রাম্য জীবন। শহরের জীবন গড়ে তুলতে তাদের অনেক সময় লেগেছিল।

আর্যদের শাসনব্যবস্থা : আর্যরা কতকগুলো ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি গোষ্ঠী আলাদা আলাদা অঞ্চলে বসবাস করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর ছিল নিজস্ব নেতা বা রাজা। পশুচারণ ভূমি দখল করা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। প্রথম প্রথম শক্তি ও সাহসের পরিচয় যার মধ্যে পাওয়া যেত তাকেই গোষ্ঠী নেতা স্থির করা হত। পরে এই নেতার পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। নেতা বা রাজাদের তখন দায়িত্বই ছিল নিজ নিজ গোষ্ঠীকে রক্ষা করা। এইজন্য প্রত্যেক রাজারই একদল যোদ্ধা থাকত।

রাজা গোষ্ঠীর মতামত নিয়ে গোষ্ঠী পরিচালনা করতেন। তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধানকে বলা হত সেনানী। তাঁর থাকতো একজন পুরোহিত যিনি রাজার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনা করতেন এবং রাজাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। আর থাকত রাজার একদল দূত, যাদের সাহায্যে রাজা আশেপাশের গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রত্যেক গ্রামের প্রধানকে বলা হত গ্রামনী। তা ছাড়া রাজাকে সাহায্য করত সভা ও সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠান। সমিতিতে সবাই যোগদান করতে পারত। কিন্তু সভা ছিল বয়স্কদের নিয়ে গঠিত।

আর্যদের গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত বিশ। আর গোষ্ঠীর লোকদের বলা হত জন। কতকগুলো পরিবার নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। প্রত্যেক পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ ছিলেন পরিবারের প্রধান। পরিবারে মেয়েদের ছিল বিশেষ সম্মান।

গ্রামে কৃষক ছাড়া বাস করতো নানা শিল্পীরা, যারা প্রয়োজনীয় নানা জিনিস তৈরী করত। এক গ্রামে কোন জিনিস পাওয়া না গেলে সেই জিনিস পাশের গ্রাম থেকে অন্য কোন জিনিসের বিনিময়ে আনা হত। এই বিনিময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আরম্ভ হয় ব্যবসা-

বাণিজ্য। আর্যরাই ভারতে প্রথম ঘোড়া নিয়ে আসে ইরাণ থেকে। ঘোড়া ছিল তাদের খুব প্রিয় গৃহপালিত পশু।

আর্যদের সামাজিক জীবন: সামাজিক জীবনে আর্যরা ছিল চার ভাগে বিভক্ত। রাজা ও যোদ্ধাদের বলা হত ক্ষত্রিয়। এরা ছিল স্বভাবতঃই খুব শক্তিশালী। পুরোহিতদের বলা হত ব্রাহ্মণ। তারা পুজো-পার্বণ নিয়েই থকেতো। চাষী ও অন্যান্য শিল্পীদের বলা হত বৈশ্য। চতুর্থ ভাগ হল শূদ্র। তারা ওপরের তিন শ্রেণীর সেবা করত। প্রথমে যে কেউ যে কোন জীবিকা নিতে পারত। তার জীবিকা অনুসারে তার সামাজিক ভাগ স্থির হত। কিন্তু পরে জীবিকা হয়ে গেল বংশানুক্রমিক, অর্থাৎ পিতার জীবিকা পুত্রকেও গ্রহণ করতে হত। ফলে আরম্ভ হল জাতিভেদ প্রথা।

আর্য সমাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল চতুরাশ্রম ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে তারা একজন মানুষের জীবন চারভাগে বিভক্ত করতো। প্রথম ভাগ—ব্রহ্মচর্য। এ সময় গুরুগৃহে থেকে বিদ্যালাভ করা। দ্বিতীয় ভাগ—গার্হস্থ্য। এ সময় বিদ্যালাভ শেষে সংসারধর্ম পালন। তৃতীয় ভাগ—বাণপ্রস্থ। এইবার সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে ভগবানের সাধনা। চতুর্থ ভাগ—সন্ন্যাস। তখন ভগবান লাভের জন্য সকল বন্ধন ত্যাগ।

আর্যদের ধর্মীয় জীবন: আর্যরা নানা দেব-দেবীর পুজো করত। যেমন—ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, বরুণ, পবন, উষা ইত্যাদি। দেবতাদের তারা মনে করতো মহা শক্তিশালী। তাই ভয় পেত দারুণ। তারা বিশ্বাস করতো, ঠিকমত পুজো-অর্চনা করে দেবতাদের খুশী রাখা যায়। তাই দরকার হত পুরোহিতদের। পুরোহিতরা দেবতাদের খুশী রাখতে নানা যাগযজ্ঞের আয়োজন করত। যাগযজ্ঞের সময় পুরোহিতদের শস্য, গৃহপালিত পশু, বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়া হত। পান করা হত সোমরস।

কিন্তু সব লোকই এই সব যাগযজ্ঞে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন ছাড়াও এইসব লোকেরা আরও অনেক

গভীর ও গূঢ় কথা জানতে চাইত। যেমন—কেমন করে এই পৃথিবী তৈরী হল, কে মানুষকে তৈরী করল, ভগবান এল কোত্থেকে। এইসব প্রশ্নের জবাব পুরোহিতদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এইসব প্রশ্নের জবাব যাঁরা খুঁজেছিলেন তাঁদের বলা হয় ঋষি। আর এই সব প্রশ্নের জবাবও পাওয়া গেল ঋষিদের রচিত উপনিষদ নামক গ্রন্থে। উপনিষদ বেদেরই একটা অংশ।

মহাকাব্যের যুগ : রামায়ণ ও মহাভারত হল ভারতের দুই মহাকাব্য। মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ ও বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা বলে পরিচিত। তবে বিভিন্ন সময়ে নানা কাহিনী এই দুই মহাকাব্যে ঢুকে গিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক কখন এই দুই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল তা যেমন স্থির করে বলা যায় না, তেমনি মহাকাব্যের যুগ বলতে ঠিক কোন সময়কে বোঝায় তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এই দুই মহাকাব্য পাঠ করে আমরা বৈদিক যুগের ভারতবর্ষের অনেক পরিচয় জানতে পারি। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী কল্পনা হতে পারে, কিন্তু এই দুই মহাকাব্য ভারতবাসীকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করে। রামচন্দ্রের পিতার প্রতি ভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, অর্জুনের বীরত্ব, কর্ণের উদারতা ভারতবাসী সব সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখে। তাই এই দুই মহাকাব্য ভারতবাসীর কাছে খুবই আদরের।

॥ জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান ॥

জৈনধর্ম : বৈদিক ধর্মে শেষের দিকে এত বেশী কড়াকড়ি এসে গিয়েছিল যে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা চাইছিল, একটা পরিবর্তন, যেন ধর্মের নামে অত্যাচার বন্ধ হয়। এই সময়েই ভারতে জন্মগ্রহণ করেন দুই মহাপুরুষ—মহাবীর ও বুদ্ধদেব।

মহাবীর : মহাবীর ছিলেন জৈনধর্মের প্রচারক। তিনি লিচ্ছবি বংশে জন্মেছিলেন। রাজ পরিবারের সুখ-ভোগ ত্যাগ করে

তিনি অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন। তারপর তিনি বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। বারো বছর পর তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। তিনি বলতেন কোন অন্যায় না করে সৎ জীবন যাপন করাই মানুষের উচিত। সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান এবং সৎ কর্ম এই তিনটি হল মানুষের মুক্তির উপায়। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হল জৈনধর্ম।



মহাবীর

জৈনধর্মের মূল কথা হল অহিংসা। সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা বলত সেই ভাষায় জৈনধর্ম প্রচার করা হয়।

বুদ্ধদেব : বুদ্ধদেব ছিলেন শাক্য জাতির রাজকুমার। তিনিও অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করে মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। কঠোর তপস্যার পর তিনি সেই মুক্তির পথ খুঁজে পান। তখন তাঁর নাম হয় বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম হয় বৌদ্ধধর্ম।

বুদ্ধদেব বলতেন, পৃথিবীতে মানুষের জীবনই হল দুঃখময়। আর এই দুঃখের কারণ হল নানা জিনিসের উপর মানুষের লোভ। তাই তিনি সব লোভ ত্যাগ করে সৎভাবে জীবন কাটাতে বলতেন। সৎভাবে জীবন কাটানোর জন্য তিনি আটটি পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের কাজই হল সৎ জীবন যাপন করা, মনকে পবিত্র করা এবং নির্বাণ লাভ করা। আর নির্বাণ লাভ করলে মানুষের আর জন্ম হবে না। আর পুনর্জন্ম না হলে এই দুঃখময় পৃথিবীতে মানুষকে কখনও ফিরে আসতে হবে না।

বুদ্ধদেব আর্যদের ধর্মের যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান মানতেন না। জাতিভেদ প্রথাও তিনি মানতেন না। তাই তিনি সংঘ স্থাপন করেন। সেখানে সবাই এসে সৎ জীবনযাপন করতে পারত।



বুদ্ধদেব

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার : জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেননা এই দুই ধর্মে যাগযজ্ঞের বাড়াবাড়ি ছিল না। পুরোহিতদের অত্যাচার ছিল না। ভারতবর্ষের বাইরেও এই দুই ধর্ম বিশেষ করে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে গিয়েছিল। মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়ে যায়।

ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের চেষ্টা : ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব নাগাদ আর্যরা ভারতের গঙ্গানদীর উপত্যকা অঞ্চলে বন-জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছিল। যেমন পাঞ্চাল, কোশল, মগধ, বিদেহী, কাশী ইত্যাদি। ধীরে ধীরে এই সব বসতিগুলো এক একটি রাজ্যে পরিণত হয়। এই সব রাজ্যগুলোর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত মগধ রাজ্যই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

মগধের উত্থান : ৫৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মগধের রাজা হন বিম্বিসার। প্রতিবেশী রাজ্যের রাজকন্যাদের বিয়ে করে তিনি মগধের শক্তিবৃদ্ধি করেন। তা ছাড়া মগধে পাওয়া যেত প্রচুর আকরিক লোহা। এই লোহার প্রয়োজন ছিল সবার। তাই মগধের গুরুত্বও অনেক বেড়ে যায়। বিম্বিসার অঙ্গরাজ্যও জয় করেন।

বিম্বিসারের সুশাসনে মগধেব ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তিনি

যেমন প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেন তেমনি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বও করতেন। তাঁর রাজ্যের সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধের প্রতি ছিল তাঁর কড়া নজর। তাঁর রাজধানী ছিল পাটনার কাছে রাজগৃহে। কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হন।

পিতাকে হত্যা করে বিম্বিসারের পর মগধের সিংহাসনে বসেন অজাতশত্রু। তিনি কেবল যুদ্ধ করেই রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি কোশল রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ চলে দীর্ঘকাল। শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুই জয়ী হন। এই যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে মগধ সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়।

অজাতশত্রুর পর মগধে বেশ কিছুকাল গণ্ডগোল চলেছিল। শেষে নন্দবংশ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। নন্দদের যথেষ্ট অর্থ এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছিল। কিন্তু তাদের লোকে পছন্দ করত না। শেষে চাণক্য নামে এক ধুরন্ধর ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত নন্দদের কাছ থেকে মগধ দখল করে নেন।

মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ সিংহাসনে বসেই চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব জয়ের জন্য চেষ্টা করেন। এর কিছুদিন আগেই গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব জয় করে এই অঞ্চল শাসনের ভার তাঁরই এক সেনাপতির হাতে দিয়ে যান।

চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব জয় করে আজকের আফগানিস্থান পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তাছাড়া তিনি মধ্য ভারতেও অনেক রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে মহীশূর পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। কেবল পূর্ব ভারতে কলিঙ্গ নামে রাজ্যটি তিনি জয় করতে পারেননি। মগধের সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্কও ভাল ছিল না।

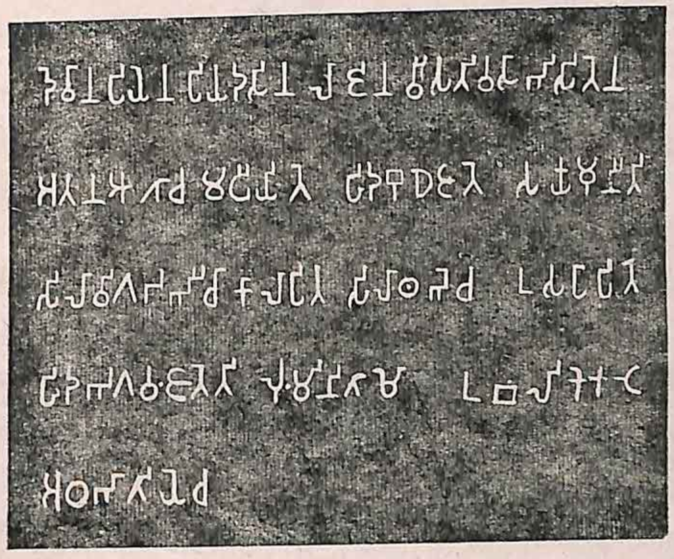
অশোক ঃ বিন্দুসারের পর সিংহাসনে বসেন মহামতি অশোক। তিনি ভারতের ইতিহাসের এক বিখ্যাত রাজা। তিনি রাজা হয়েই কলিঙ্গ জয়ে অগ্রসর হন। কলিঙ্গ জয় করলেও এই যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি অশোককে খুবই দুঃখিত করে। কেবল রাজ্যজয়ের জন্য এত



অশোক

লোকহত্যা তিনি আর মেনে নিতে পারলেন না। তিনি চিরকালের জন্য যুদ্ধ করা ত্যাগ করলেন। নিজে বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন সুখে ও শান্তিতে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এপর তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর দেশশাসন করেছিলেন। তিনি আর কোনদিন যুদ্ধ করেননি। যাই হোক কলিঙ্গ জয়ের ফলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একজন রাজার অধীনে এল। এমনটা এর আগে তার কোনদিনই হয়নি। অশোক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। নিজরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি

স্তম্ভলিপি, শিলালিপি এবং রাজুক নামে একদল কর্মচারীর সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রজাদের তিনি সন্তানের মত ভালবাসতেন। এসব কারণে তিনি 'মহামতি অশোক' নামে বিখ্যাত।



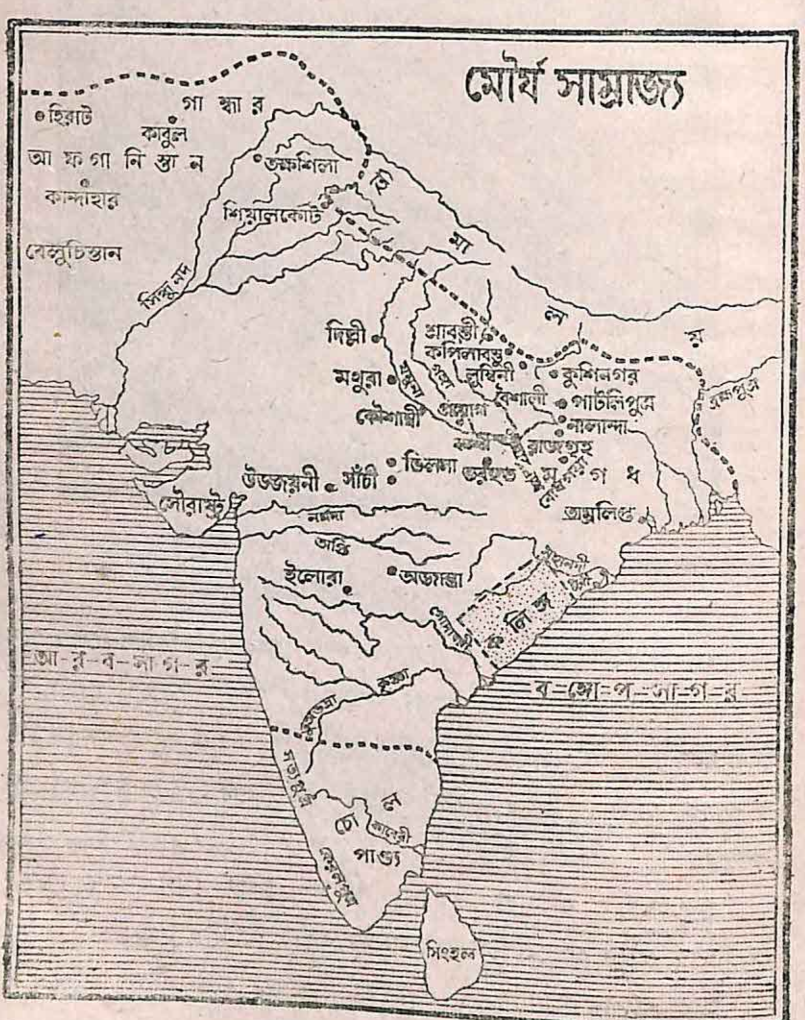
অশোকের শিলালিপি

অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে মৌর্যবংশের গৌরবের দিনও শেষ হয়ে যায়। ফলে বিশাল সাম্রাজ্যে আবার দেখা দেয় গণ্ডগোল, বিশৃংখলা। শেষ পর্যন্ত পুষ্যমিত্র শুঙ্গ নামে এক রাজা শেষ মৌর্য রাজাকে তাড়িয়ে মগধ দখল করেন এবং শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শুঙ্গ বংশীয় রাজারা একশো বছরের কিছু বেশী সময় উত্তর ভারতের কতক অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন।

শুঙ্গ বংশের অবসানের একশো বছরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিরাট এলাকা জুড়ে এক বিদেশী উপজাতি এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে। এই রাজ্য কুষাণ রাজ্য নামে পরিচিত।

কুষাণ রাজ্যঃ কুষাণরা প্রথমে বাস করতো চীনা তুর্কিস্থানে পরে তারা কাবুল ও কান্দাহার দখল করে ক্রমশঃ ভারতের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই কুষাণ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন কণিষ্ক।



কণিষ্ক ছিলেন এক বিখ্যাত বীর এবং সুশাসক। পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে পূর্বে মগধ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল তাঁর রাজ্য।

ভারতের বাইরে মধ্য-এশিয়ার কিছু অঞ্চলও তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা এখনকার পেশোয়ারে। কিন্তু কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণ বংশ দুর্বল হয়ে যায়। শেষে গুপ্ত বংশের অধীনে আবার ভারতে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী রাজ্য।


কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

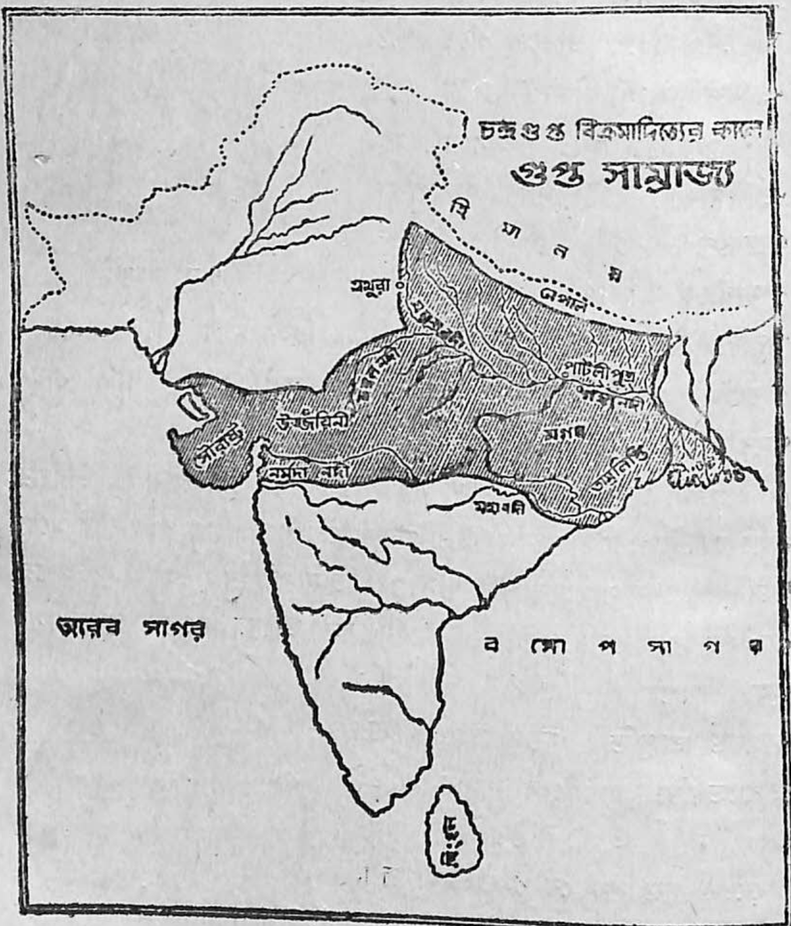
গুপ্ত সাম্রাজ্যঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি লিচ্ছবীর রাজকুমারীকে বিবাহ করে রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল মগধ থেকে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মাত্র দশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর মগধের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। গুপ্ত রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি পরপর কয়েকটি যুদ্ধ করে যে সব রাজাদের পরাজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রুদ্রদেব, চন্দ্রবর্মণ, গণপতি, নাগদত্ত প্রভৃতি। ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁকে বাধা দেবার আর কেউই রইল না। তাঁর শক্তির কথা এমন ছড়িয়ে গিয়েছিল যে সমতট, কামরূপ, নেপাল, পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতের কয়েকটি রাজা বিনাযুদ্ধে তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন।


মুদ্রা—বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

উত্তর ভারতের পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত জয়ে এগিয়ে এলেন। এখানকার অনেক রাজাও যুদ্ধ ছাড়াই তাঁকে নিজেদের রাজা বলে

স্বীকার করে নেয়। আবার কয়েকটি যুদ্ধও তাঁকে করতে হয়েছিল; যেমন—মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কুরলের মন্তরাজ, বেঙ্গির হস্তি বর্মন প্রভৃতির সঙ্গে। সমুদ্রগুপ্ত কিন্তু এসব রাজ্য জয় করলেও তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেননি। তখনকার দিনে যখন ভাল যোগাযোগ



ব্যবস্থা ছিল না, সুদূর উত্তর ভারতে বসে দক্ষিণ ভারত শাসন করা সম্ভব নয়, একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক শেষ

পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা দাঁড়ায়, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী।

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার মত রাজ্যজয় করতে চাইলেন। এই সময় পশ্চিম ভারতে শক বলে এক বিদেশী জাতি রাজত্ব করত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এদের পরাজিত করেন। তাছাড়া তিনি জয় করেন বাংলাদেশ এবং সিন্ধুনদের তীরে বহ্লীক জাতির রাজ্য।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনী নগরে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত। তিনি কোন নতুন রাজ্য জয় করতে না পারলেও পিতার সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তিনি **'মহেন্দ্রাদিত্য'** উপাধি নিয়েছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা হলেন স্কন্দগুপ্ত। পিতা কুমারগুপ্তের জীবিতকালেই মধ্য ভারতের পুষ্যমিত্র নামে এক উপজাতি মগধ আক্রমণ করে। স্কন্ধগুপ্ত এই আক্রমণ রোধ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মধ্য এশিয়া থেকে হূণজাতি বার বার মগধ আক্রমণ করতে থাকে। এই হূণজাতি ছিল দুর্দান্ত যোদ্ধা। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত এদের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন যে হূণজাতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যাই হোক স্কন্দগুপ্তের পর থেকেই গুপ্ত বংশের পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু তা হলেও দীর্ঘকাল তারা ভারতবর্ষে তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছিল। মৌর্যরা যেখানে মাত্র ১৩৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন সেখানে গুপ্তবংশ প্রায় তিনশো বছর তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

প্রাচীন বঙ্গের কথা : আর্যসাহিত্য বেদে বঙ্গের কোন উল্লেখ নেই। তবে বৃহৎসংহিতায় বঙ্গের নাম পাওয়া যায়। সে সময় বঙ্গদেশের বহু ভাগ ছিল। এক এক ভাগের রাজারা শক্তিশালী

হয়ে সারা বঙ্গে বা বঙ্গের বৃহৎ অংশে কর্তৃত্ব করতেন। এরূপ ভাগ-গুলোর নাম বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র বর্ধন বা বরেন্দ্রভূমি, রাঢ়, গৌড় ইত্যাদি।

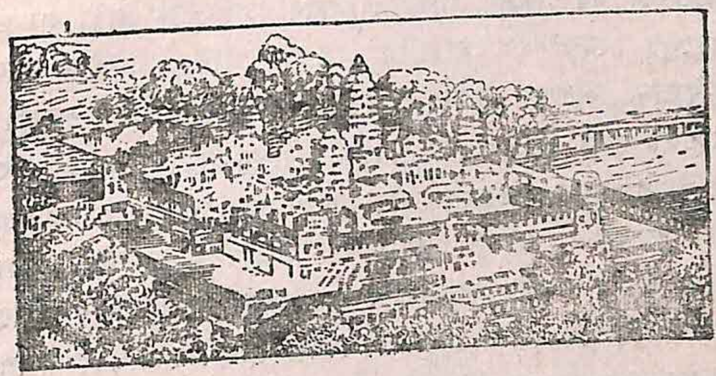
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ আছে রাঢ় দেশে মহাবীর ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গের রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। শোনা যায়, আলেকজাণ্ডার ভারতের পূর্বদিকে গঙ্গারিডি বা গঙ্গাহৃদি নামে এক শক্তিশালী জাতির কথা শুনে পাঞ্জাব জয় করে আর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। এই গঙ্গারিডি জাতিকে অনেকে বলেন বঙ্গদেশের অধিবাসী। মৌর্য যুগে বঙ্গদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গুপ্তযুগে সমুদ্রগুপ্ত ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত নিজ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন সে কথা এলাহাবাদ প্রশস্তিতে লেখা আছে। তাছাড়া গুপ্তযুগের পতনের মুখে গৌড় এক শক্তি-শালী রাজ্যে পরিণত হয়। এবং পরবর্তীকালে রাজা শশাঙ্ক উত্তর ভারতের অনেক অংশ জয় করে গৌড় রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করেন এবং গৌড়কে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক : ভারতের তিনদিকে সমুদ্র আর অন্যদিকে দুর্লংঘ্য হিমালয় পর্বতমালা। কিন্তু এই প্রাকৃতিক বাধা সত্ত্বেও ভারত কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। কখনও ভারতীয়রা সাগর পেরিয়ে বিদেশে গিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে। কখনও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গিরিপথ দিয়ে নানা বিদেশী জাতি ভারতে এসেছে। কেউ এসেছে এদেশ জয় করতে, কেউ এসেছে বসবাস করতে, কেউবা বাণিজ্যের লোভে। কিন্তু কারণ যাইহোক, কালে কালে বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বেড়েই গিয়েছে।

ভারত ও সিংহল : ভারতের এক নিকট প্রতিবেশী রাজ্য সিংহল। শোনা যায় সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে নিজ পুত্র বা ভ্রাতা মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন।

ফলে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। সিংহলের বহু মন্দিরে ভারতের শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভারত ও কম্বুজ ঃ এখন যে অঞ্চলকে বলা হয় কাম্বোডিয়া প্রাচীনকালে তারই নাম ছিল কম্বুজ। এই কম্বুজের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। এখানে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ এক



আংকোর ভাটের মন্দির

ভারতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল আংকোর ধাম। এখানে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। এখানকার আংকোর ভাটের মন্দির পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা কাহিনী খোদাই করা আছে।

ভারত ও যবদ্বীপ ঃ যবদ্বীপ হল বর্তমান জাভা। এখানেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এখানেই রয়েছে বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির বরবুদরের মন্দিরটি। মন্দিরের গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা কাহিনী চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে শিল্পীরা গিয়ে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।

ভারত ও সুমাত্রা ঃ এখন যার নাম মালয় তখন তার নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। আর সুবর্ণদ্বীপের অধীনে ছিল সুমাত্রা। জানা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় সুমাত্রাই বৌদ্ধবিদ্যা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশের গোড়া পত্তন হয় সুমাত্রা দ্বীপেই। ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব এখনও রয়েছে এই অঞ্চলে।

ভারত ও তিব্বত ঃ ভারতের আর এক নিকট প্রতিবেশী হল তিব্বত। বৌদ্ধধর্মের সূত্রে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের এক নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব।

ভারত ও মধ্য এশিয়া ঃ মধ্য এশিয়ার নানা জায়গায় মাটি খুঁড়ে যে সব নির্দশন পাওয়া গিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় এই অঞ্চলের সঙ্গেও ছিল ভারতের গভীর সম্পর্ক। খোটান, চীনা, তুর্কিস্তান, কাশখড়, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বিশেষ করে চীন ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তা হত মধ্য-এশিয়ার মধ্য দিয়েই। এই পথকেই বলা হয়েছে 'প্রাচীন সিল্কের পথ'। কারণ তখন চীনের সিল্কই ছিল বাণিজ্যের প্রধান বস্তু। এমন নজীরও পাওয়া গিয়েছে যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করত এই পথে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ঃ যুগে যুগে কত না বিদেশী এদেশে এসেছেন। কেউ কেউ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের এইসব রচনা আমাদের কাছে মহা মূল্যবান। কেননা তাদের রচনা তখকার দিনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। এরকম দু'জন বিদেশী পর্যটক হলেন মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন।

মেগাস্থিনিস ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে সিরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকস মেগাস্থিনিসকে পাঠিয়েছিলেন এদেশে দূত হিসেবে। মেগাস্থিনিস এদেশ থেকে ফেরার পর তাঁর অভিজ্ঞতা 'ইণ্ডিকা' নামে একটি বইতে লিখে রেখে গিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর বইটি আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন বইতে তাঁর রচনা থেকে যেসব উদ্ধৃত দেওয়া হয়েছিল, সেই সব উদ্ধৃতিগুলো হল মৌর্যযুগকে জানার এক বিরাট অবলম্বন।

মেগাস্থিনিস লিখেছেন মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল এক

সুন্দর শহর। চারদিকে ছিল শক্ত প্রাচীর। অধিকাংশ বাড়ী ছিল কাঠের তৈরী। রাজপ্রাসাদ ছিল পাথরের তৈরী। রাজ পরিবারের বিলাসিতায় মেগাস্থিনিস অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। রাজা সর্বদাই জনসাধারণের অভিযোগ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষক। কৃষির উৎপাদনও ছিল প্রচুর। প্রচুর বৃষ্টি হত। দেশে দুর্ভিক্ষও ছিল না। অন্যান্য জীবিকার লোকও ছিল।

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, এদেশে কেউ কাউকে অবিশ্বাস করত না। আবার অপরাধ করলে তার শাস্তি ছিল খুব কঠোর। সমাজে মেয়েদের খুব সম্মান ছিল।

ফা-হিয়েন ঃ মেগাস্থিনিসের সাতশো বছর পর ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। তিনি যখন আসেন তখন গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল। তিনি এদেশে প্রায় পনের বছর কাটিয়ে যান। তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন। তিনি তিন বছর কাটিয়েছিলেন পাটলিপুত্রে।

তিনি তখনও পাটলিপুত্রের অবস্থান দেখে লিখেছেন যে, এমন শহর যে কোনও মানুষের হাতে তৈরী হতে পারে তা বিশ্বাস করাই যায় না।

পাটলিপুত্র ছাড়া তিনি পুরুষপুর, তক্ষশিলা, মথুরা, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, কান্যকুব্জ, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের লোক এখানে মিলেমিশে সুখে বসবাস করত।

ফা-হিয়েনও ভারতবাসীর সততা ও ন্যায়বোধের প্রশংসা করেছেন। ধনী লোকেরা বিভিন্ন সংঘে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনেক দান করত। চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। রাত্রিবেলায় লোকে দরজা খোলা রেখেই ঘুমাতে পারত। তিনি সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার কথা লিখেছেন।

ফা-হিয়েন এদেশের উন্নত আর্থিক অবস্থার কথাও লিখেছেন।

ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এদেশে মশলা, সুগন্ধি, চন্দন, মণিমুক্তা বিদেশ থেকে আনা হত। তখনকার দিনে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) খুব ব্যস্ত বন্দর ছিল।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি : সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত এই দীর্ঘ ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ। আমরা বিশ্ববাসীর কাছে আজও এ যুগের জন্যই বিশেষ শ্রদ্ধার আসন পেয়ে থাকি। যেমন মৌর্য যুগে তেমনি গুপ্ত যুগে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল।

মৌর্য শিল্প : প্রজাদের অশোক যে সব উপদেশ দিতেন তা তিনি পাহাড়ের গায়ে বা লম্বা পাথরের স্তম্ভে খোদাই করে লিখে দিতেন। এই সব স্তম্ভ বালুপাথরে তৈরী হত। স্তম্ভগুলো এত চমৎকার পালিশ করা হত যে তার ওপর সূর্যের আলো পড়লে সোনার তৈরী বলে মনে হত। প্রতিটি স্তম্ভের মাথায় থাকতো হাতি, ষাঁড় বা সিংহের মূর্তি। সারনাথে এরকম একটি স্তম্ভের মাথায় ছিল চারটি সিংহের মূর্তি। এই মূর্তিটিই আজ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গুপ্তযুগে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এত উন্নতি হয়েছিল যে এই যুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। গুপ্ত রাজাদের সুশাসনে দেশে শান্তি-শৃংখলা বজায় ছিল। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল। ফলে লোকের হাতে ছিল অনেক অবসর সময়। এই অবসর সময় তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাধনায় ব্যয় করতে পেরেছিল। তাই এই যুগে ঘটেছিল অসাধারণ উন্নতি।

গুপ্ত যুগের সাহিত্য : সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এই যুগে চরম উন্নতিলাভ করেছিল। মহাকবি কালিদাস এই যুগেই জন্মেছিলেন। তাঁর কাব্য ও নাটক বিশ্ব-সাহিত্যের এক মহামূল্যবান সম্পদ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনও ছিলেন একজন কবি। সমুদ্রগুপ্ত নিজেই ছিলেন কবি ও সংগীতজ্ঞ। তাঁর সভাকবি হরিষেণও কাব্য

রচনায় দক্ষ ছিলেন। 'মুদ্রা রাক্ষস' নাটকের লেখক বিশাখদত্ত ও 'মৃচ্ছ কটিকের' লেখক শূদ্রক এ যুগেই জন্মেছিলেন। এ যুগেই পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত নতুন করে লেখা হয়।

ভাস্কর্য শিল্প ও গুপ্তযুগ ঃ গুপ্তযুগে ভাস্কর্য শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বারাণসীর নিকট সারনাথে যে বৌদ্ধ সংঘ আছে তা গুপ্ত-যুগেই নির্মিত হয়। এখানে লোহার তৈরী যে বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তা এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ ছাড়া দিল্লীর কাছে যে লৌহস্তম্ভ রয়েছে তা তো এখনকার লোকের কাছেও এক বিস্ময়। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে নির্মিত সেই লৌহস্তম্ভ। কিন্তু এখনও আগা-গোড়া কী মসৃণ এবং এখনও এক ফোঁটাও মরচে ধরেনি। এটা গুপ্তযুগের ধাতু বিদ্যার অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়।


অজন্তার গুহাচিত্র

চিত্র শিল্প ও গুপ্তযুগ ঃ চিত্র শিল্পেও গুপ্তযুগের কৃতিত্ব ভোলার নয়। অজন্তা ও ইলোরার গুহা চিত্রগুলো এই যুগের চিত্রশিল্পের উন্নতির প্রমাণ। এই সব চিত্রে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা কাহিনী আঁকা রয়েছে। ছবিগুলোর রং এমন ভাবে তৈরী ছিল যে এখনও দেখলে নতুন মনে হয়। গুহার ভেতরে যেখানে সূর্যের আলোও ভাল প্রবেশ করতে পারে না সেখানে সেই যুগে শিল্পীরা দিনের পর দিন কিভাবে যে ঐ ছবিগুলো এঁকেছিলেন তা এখন ভাবাই যায় না।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান : শুধু সাহিত্য ও শিল্পেই নয়, বিজ্ঞান চর্চাতেও যে গুপ্তযুগ কেমন উন্নত ছিল তারও বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এ যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা হলেন আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি।

এ সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ করে শল্য চিকিৎসার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছিল। নানা রকমের গাছপালা ও ধাতু মিশিয়ে বহু রকমের ওষুধ তৈরীর খুব প্রচলন ছিল এ সময়।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসে এদেশের জীবনযাত্রায় নিয়ে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্লাবনে ধর্মীয় জগতে ঘটে যায় এক নিঃশব্দ বিপ্লব। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ঘোষণা করে এক নতুন মূলমন্ত্র, অহিংসা যার নাম। তারপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকাল থেকেই ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের যুগ। আর তার সঙ্গেই ঘটেছিল অসাধারণ সাংস্কৃতিক অগ্রগতি।

অনুশীলনী

(ক) **রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :—**

১। ভারতে আসার আগে আর্যরা কোথায় বাস করতো? এদেশে কোন অঞ্চলে তারা প্রথম বসতি স্থাপন করে? তাদের কথা আমরা কেমন করে জানতে পারি?

২। আর্য শাসন ব্যবস্থায় রাজা কিভাবে দেশ শাসন করতেন? কারা তাঁকে একাজে সাহায্য করতেন?

৩। আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা এল কি করে? তাদের সমাজের অপর বৈশিষ্ট্যটি কি?

৪। মগধের প্রধান হয়ে ওঠার কারণ কি কি? বিম্বিসার মগধকে শক্তিশালী করার জন্য কি কি করেছিলেন?

৫। বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে লোকে বিরক্ত হয়েছিল কেন? জৈন ও বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়েছিল কেন? বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা কি কি?

৬। কনিষ্ক কে ছিলেন? তিনি কিভাবে রাজ্যকে শক্তিশালী করেন?

৭। ফা-হিয়েন কে ছিলেন? তিনি কেন ভারতে এসেছিলেন? ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি কি লিখেছিলেন?

৮। কোন যুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়? এই যুগে এমন উন্নতি হয়েছিল কেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
সভা, সমিতি, গ্রামণী, উপনিষদ।

২। জৈন ধর্মের মূলকথা কি?

৩। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যসীমা কি ছিল? কে তাঁকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেন?

৪। কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের মনে কি পরিবর্তন আনে? তারপর তিনি কি করেন?

৫। গুপ্তযুগে কোন্ কোন্ বিষয়ে সর্বাধিক উন্নতি হয়। কোন্ কোন্ সাহিত্যের উন্নতি হয়?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নঃ—

১। 'ক' স্তম্ভের নামগুলোর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের ঘটনাগুলো মেলাও :—

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
(অ) বিম্বিসার	(অ) কোশল রাজ্য আক্রমণ করেন
(আ) অঙ্গ	(আ) ভারতের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত রাজ্য।
(ই) অজাতশত্রু	(ই) অঙ্গ রাজ্য জয় করেন।
(ঈ) গান্ধার	(ঈ) মগধের পূর্বে অবস্থিত একটি রাজ্য

২। নীচের বাক্যগুলো ঠিক কিনা বল :—

(অ) বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা মানতেন।

(আ) মহাবীর মানুষের মুক্তির জন্য তিনটি পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(ই) জৈন ধর্মের লক্ষ্য ছিল নির্বাণলাভ।

(ঈ) বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(অ) বৌদ্ধধর্ম সৎ জীবন যাপনের জন্য — পথের নির্দেশ দেয়।

(আ) বুদ্ধদেব — বংশে জন্মেছিলেন।
(ই) বুদ্ধ শব্দের অর্থ —
(ঈ) — জৈনধর্ম বিশ্বাস করে।
(উ) বিম্বিসারের রাজধানী ছিল —।
(ঊ) বিম্বিসার — হস্তে নিহত হন।

৪। নীচের ঘটনাগুলো যেগুলো আগে ঘটেছিল সেগুলো আগে লেখ।
(অ) অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করেন।
(আ) চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক সেনাপতিকে পরাজিত করেন।
(ই) আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব জয় করেন।

(ঘ) **মৌখিক প্রশ্ন ঃ—**

(১) গুপ্তযুগের ধাতুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?
(২) এই যুগের চিত্রশিল্পের নিদর্শন কোথায় দেখা যায়?
(৩) এই যুগে বাংলাদেশের ব্যস্ত মন্দিরটির নাম কি?
(৪) এই সময় ভারত বিদেশ থেকে কি কি জিনিস আমদানী করতো?
(৫) গুপ্তযুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম বল।
(৬) এই যুগে বিখ্যাত বৌদ্ধসংঘটি কোথায় নির্মিত হয়েছিল?
(৭) মৌর্যযুগে কোন্ গ্রীক দূত এদেশে এসেছিলেন?
(৮) স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীক চিহ্নটি কি?
(৯) এই চিহ্নটি কোথায় ছিল?
(১০) আংকোরধাম ও বরবুদর কিজন্য বিখ্যাত?

(ঙ) **কর্মশিক্ষার নির্দেশনা ঃ—**

১। একটি ভারতের মানচিত্র এঁকে তাতে নীচের স্থানগুলো নির্দেশ কর ঃ— গঙ্গানদী, সিন্ধুনদ, কোশলরাজ্য, মগধরাজ্য, রাজগৃহ, অবন্তী, পাটলিপুত্র।

২। একটি খাতায় গুপ্ত যুগের বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টির উদাহরণ সংগ্রহ কর।

৩। তোমার সহপাঠীদের নিয়ে পাটনা, নালন্দা রাজগীর বেড়িয়ে আসবার জন্য একটি ভ্রমণ-সূচী তৈরী কর।

———

প্রাচীন যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ঃ সময়ানুক্রমিক

সময়	ঘটনা
প্রায় চরশ' কোটি বছর আগে	পৃথিবীর সৃষ্টি
খৃঃ পূঃ ৫০০,০০০ — ১০,০০০ অব্দ	— পুরানো প্রস্তর যুগ
” ১০,০০০ — ৫,০০০ ”	— নতুন প্রস্তর যুগ
” ৫,০০০ — ”	— তাম্র ব্রোঞ্জযুগের সূচনা
” ৪,৫০১ ”	— মেসোপটেমিয়া সভ্যতা
” ৪,০০০ ”	— মিশর সভ্যতা ও লৌহ যুগের সূচনা
” ৩,২৫০ ”	— সিন্ধু সভ্যতা
” ২,৮৫২ ”	— চীন সভ্যতা
” ২,৫০০ ”	— আর্যদের ভারত আগমন
” ২,১২৩ — ২০৮১ ”	— হামুরাবির (ব্যাবিলন) শাসনকাল
” ১,৭৬৬ — ১১২৩ ”	— শাং (চীন) বংশের শাসনকাল
” ১,৫৪৫ — ১৫১৪ ”	— প্রথম থুথমিসের (মিশর) শাসনকাল
” ১,৪৭৯ — ১৪৪৭ ”	— তৃতীয় থুথমিসের শাসনকাল
” ১,৩০০ — ১২৩৩ ”	— দ্বিতীয় রামেসিসের (মিশর) শাসনকাল
” ১২২০ — ”	— ইহুদীদের মিশর ত্যাগ
” ১০১০ — ৯৭৪ ”	— ডেভিডের শাসনকাল
” ৯৭৪ — ৯৭৩ ”	— সলোমনের শাসনকাল
” ৭৫৩ অব্দ	— রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা
” ৬৬০ — ৫৮৩ ”	— জরথুষ্ট্রের জীবনকাল
” ৬০৫ — ৫৫২ ”	— নেবুক্যাডনেজারের জীবনকাল
” ৬০০ — ৫২৮ ”	— মহাবীরের জীবনকাল

খৃঃ পূঃ	৫৫৯	—	৫২৯ অব্দ	—	কাইরাসের জীবনকাল
,,	৫৫৬	—	৪৮৬ ,,	—	বুদ্ধদেবের জীবনকাল।
,,	৫৫১	—	৪৭৮ ,,	—	কনফুসিয়াসের জীবনকাল
,,	৫৩৮ অব্দ			—	ব্যবিলন সভ্যতার পতন
,,	৫২১	—	৪৮৫ ,,	—	দারায়ুসের জীবনকাল
,,	৪৯০ অব্দ			—	ম্যারাথনের যুদ্ধ।
,,	৪৮৫	—	৪২৩ ,,	—	জারেকসসের শাসনকাল
,,	৪৩১ অব্দ			—	পেলোপনেশিয়ার যুদ্ধ
,,	৪২৯ অব্দ			—	পেরিক্লিসের যুদ্ধ
,,	৩৫৯	—	৩৩৬	—	দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনকাল
,,	৩৩৬	—	৩২৪ ,,	—	আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল
,,	৩২১	—	৩০০ ,,	—	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকাল
,,	৩২৬ অব্দ			—	ঝিলমের যুদ্ধ
,,	৩০৫ ,,			—	মেগাস্থিনিসের ভারত আগমন
,,	২৭৩	—	২৩২ ,,	—	অশোকের শাসনকাল
,,	২৫৫	—	২০৬ ,,	—	চীন বংশের শাসনকাল
,,	২৩০	—	২২২ ,,	—	শি-হুয়াংতির শাসনকাল
,,	৭৩ অব্দ			—	স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ
,,	৬০	—	৪৪ অব্দ	—	জুলিয়াস সীজারের শাসনকাল
,,	৩০ অব্দ			—	মিশর সাম্রাজ্যের পতন
খৃষ্টাব্দ	৭৮	—	১০১ ,,	—	কুষাণ শাসনকাল
,,	৩৪০	—	৩৭৬ ,,	—	সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল
,,	৪০০ অব্দ			—	ফা-হিয়েনের ভারত আগমন
	৪৭৬			—	পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন